boierpathshala.blogspot.com

স্মৃতির শহর

শামসুর রাহমান

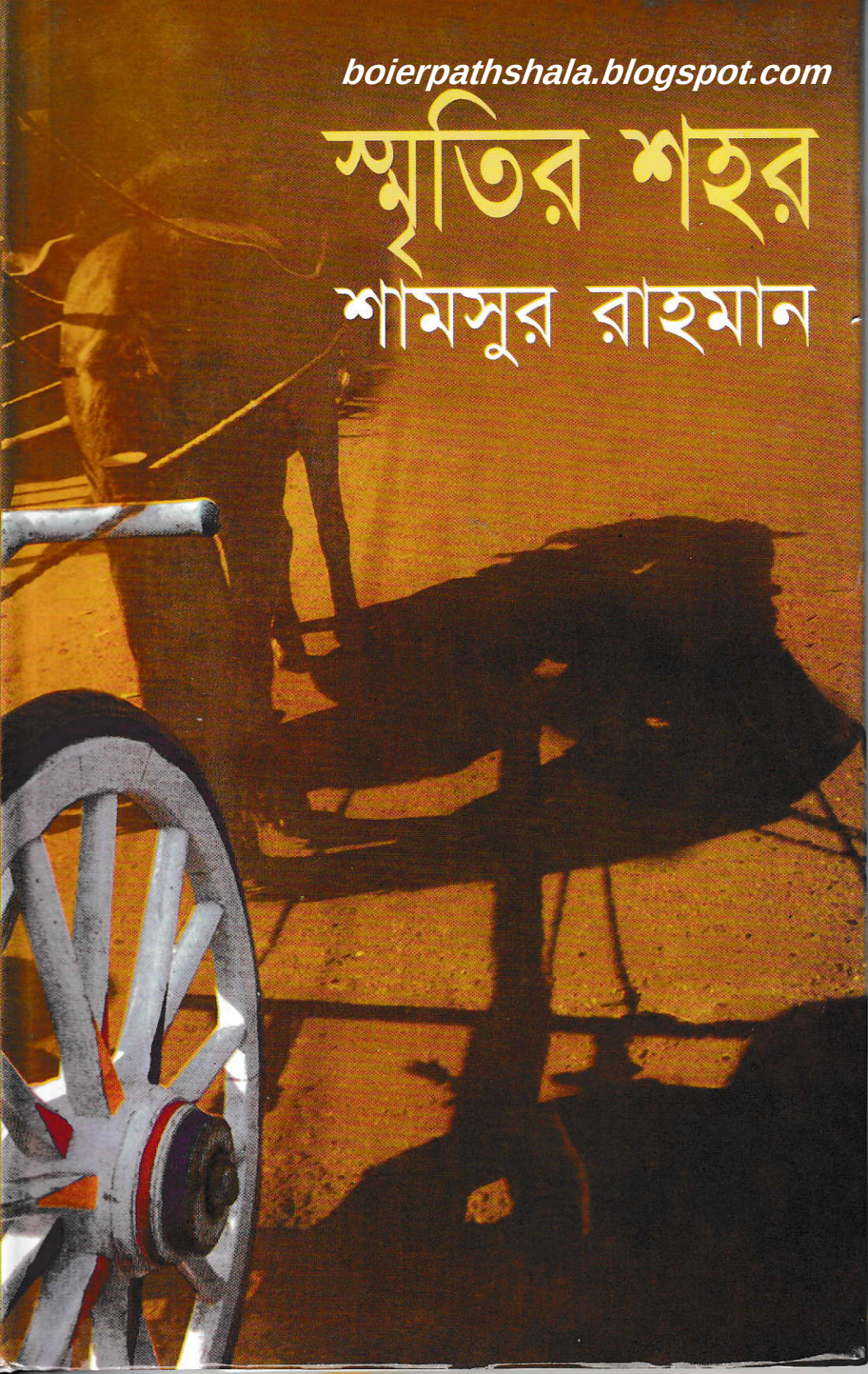

শামসুর রাহমান

স্মৃতির শহর

সাহিত্য বিলাস

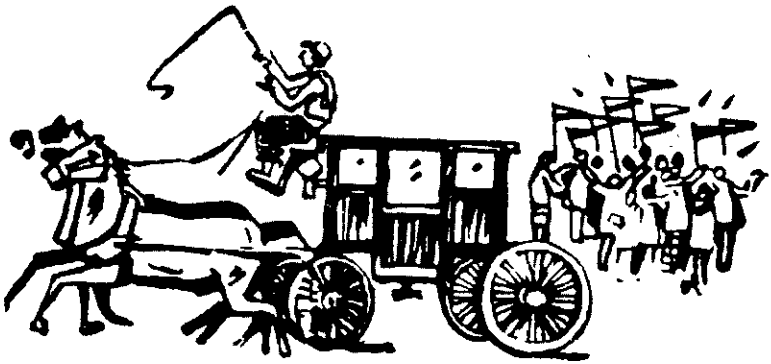

স্মৃতির শহর
শামসুর রাহমান

প্রকাশকাল : দ্বিতীয় সাহিত্য বিলাস সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯
প্রকাশক : শ. ম. গোলাম মাহবুব সাহিত্য বিলাস, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : পলাশ খান। অলংকরণ : রফিকুন্নবী।
স্বত্ব : লেখক। কম্পোজ : গ্যালাক্সী প্রিন্টার্স। মুদ্রণ : অক্ষর বিন্যাস প্রিন্টিং প্রেস,
৫৯/৩, ইসলামপুর রোড, বাবুবাজার ঢাকা-১১০০।
মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Published : Second Edition: February 2009
SMRITIR SHAHAR By SHAMSUR RAHMAN
Published by S. M. Golam Mahbub, Shahitya Bilash.
38/4, Banglabazar, Dhaka-1100.
Cover Design: Dhruba Esh. Illustration : Rafiqunnabi
Price : Taka 120.00 Only
USS : 8.00 Only

ISBN 984- 8708- 22- 7

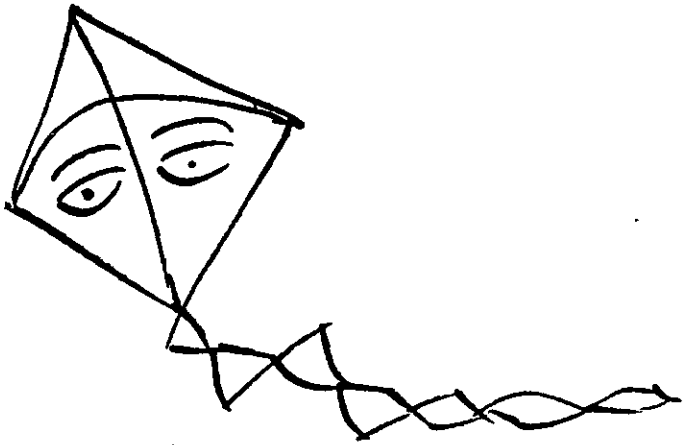

উৎসর্গ

মতিন,

আমার এই লেখা তুমি পড়োনি, পড়বে না কোনোদিন,

তবু তোমারই স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

আমি রাজপুত্তুর নই, তাই আমার ডানাঅলা ঘোড়া পক্ষিরাজ নেই। পক্ষিরাজ নেই, কিন্তু আছে ঘুরে বেড়ানোর শখ। ধুলোওড়া পথ, ছায়ামাখা পথ, লোকগিজগিজ পথ, সুনসান পথ—সবরকম পথ ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে আমার। ভালো লাগে পথে যেতে-যেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে নানা জিনিস, খুঁটিনাটি অনেক কিছু। এই ধরো, গাছগাছালি, পাখপাখালি, নোড়ানুড়ি, কাটকুটরো, কত্তকিছু দেখি চোখ মেলে। কখনো চলতে চলতে, কখনো দাঁড়িয়ে খানিক। লোকজন, বাড়িঘর—তাও দেখি। যখন কোনো পুরোনো বাড়ি চোখে পড়ে, মন কেমন উদাস হয়ে যায়। এমন বাড়ি, যার সারা শরীরে সবুজ রঙের শ্যাওলা, এখানে-ওখানে বুনো গাছের উঁকিঝুঁকি দরজা খোলা, অথচ ভেতরে ঢুকতে ভয় করে, গা শিরশির করে ওঠে! ঐ গা-ছমছম-করা বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবি, কারা থাকত এখানে? ভালো করে দেখি, দরজায় বাঘের মুখে ঘাস কিংবা হরিণের মুখে গোস্ত আছে কি না। না, ওরকম কিছুই নেই দরজায়। পা বাড়ালেই অন্দরমহলে চ'লে যাওয়া যায়। আমি কিন্তু ভেতরে যাইনি। বাইরে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করি, "বাড়িতে কেউ আছেন?" প্রশ্নের জবাব আসে না, তবে একটি কি দুটি চামচিকে ওড়াউড়ি ক'রে জানান দেয় যে, ওরা এ-বাড়ির বাসিন্দা। আমি সেই সবুজ রঙের শ্যাওলা-ঢাকা, ছায়া-ছায়া বাড়ি ছেড়ে চলে যাই অন্য কোথাও। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে; কিছুটা ভয় পেয়ে, ভয় পাওয়ার আনন্দে কিছুটা।

পায়ে ধুলো জমে, আলো কমে আসে আকাশের, গাছের ঘন ডালে, খালে বিলে, উড়ন্ত চিলের নরম ডানায়, কাঁকর-বিছানো পথে। আলো ক'মে আসে। সূর্য নিবুনিবু। কাঁকর-বিছানো পথে হাঁটি, কোনোমতে পা টেনে টেনে। ভাবি, সেই পুরোনো বাড়িটার কথা। কারা থাকত বাড়িটায়? কী তাদের নাম ছিল? ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে ছিল কোনোদিন সেখানে? ওরা কি হাফপ্যান্ট, শার্ট, ফ্রক প'রে খেলা করত বারান্দায়, উঠোনে, বাড়ির পেছনের বাগানে? নিশ্চয়ই ওদের সুন্দর সুন্দর, ভারি মিষ্টি নাম ছিল সব। ইষ্টিকুটুমেরা সেই নামে ডাকত ওদের। ভাবি তাদের কথা যাদের আমি কোনোদিন দেখিনি।

এবার তোমাদের আরেকটা পুরোনো বাড়ির কথা বলব। অনেক অনেকদিন আগের কথা। তখন আমাদের এই চমৎকার দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন আলেকজান্ডার। জানই তো মস্ত বড় বীর ছিলেন তিনি। সারা দুনিয়া জয় করতে বেরিয়েছিলেন তিনি নিজের দেশ ছেড়ে। তাঁর অনেক সৈন্যসামন্ত ছিল—সেই সৈন্যদলে ছিল পদাতিক আর ঘোড়সওয়ার। পদাতিক বলে ওদের, যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে ঢাল তরোয়াল, বল্লম দিয়ে যুদ্ধ করে। আর গোড়সওয়াররা ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে অস্ত্র চালায়। আলেকজান্ডারের সেপাইরা যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল খুবই ওস্তাদ। ওদের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠত না কেউ। পেরে উঠত না বলেই আলেকজান্ডার দেশের পর দেশ জয় করতে পেরেছিলেন। আলেকজান্ডারের সেপাইরা যুদ্ধ করতে করতে চলে এল থিব্‌স্ নগরে। নগরটা ওরা দখল ক'রে ফেলল, আর দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হ'ল ভাঙাচোরার কাজ। জয়ের খুশিতে বেহুঁশ হয়ে সেপাইরা এটা ভাঙে, ওটা তছনছ করে; কোথাও-বা লাগায় দাউদাউ আগুন। ছোট্ট খেলনার মতো একটা বাড়ি। ওটাও ভাঙতে গেল তারা। কিন্তু বাধা দিলেন আলেকজান্ডার নিজেই। "ও-বাড়িতে হাত দিয়ো না তোমরা!" হুকুম করলেন তিনি। তাই শাবল আর গাঁইতির মার খেতে হ'ল না সেই ছোট্ট খেলনার মতো বাড়িটাকে।

তোমরা হয়তো এ ভেবে অবাক হচ্ছ, এত্তকিছু ভাঙাচোরার পর বীর আলেকজান্ডার ঐ ছোট্ট বাড়িটা ভাঙতে মানা করলেন কেন। আলেকজান্ডার জানতেন, ঐ ছোট্ট বাড়িটায় থাকতেন কবি পিন্ডার। নামজাদা কবি। ঐ বাড়িতে ব'সে আপনমনে কত্ত কবিতা লিখেছেন তিনি, ঘুঙুরের মতো বাজিয়েছেন শব্দকে। এসব কথা জানতেন আলেকজান্ডার। পিন্ডারের মতো কবির বাড়ি কি কোদাল মেরে ভেঙে ফেলা যায়? বাড়িটা সামান্য হ'লে কী হবে, যিনি বাড়িটাতে থাকতেন তিনি তো আর সামান্য কেউ ছিলেন না! মস্ত বড় কবি ছিলেন তিনি, দশজনের চেয়ে আলাদা একজন, যাকে বলে অসাধারণ। তাই আলেকজান্ডার ঐ ছোট্ট বাড়িটাকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের খাতিরেই মানুষ অনেক যত্ন করে রাখে পুরোনো, নড়বড়ে বাড়ি, অনেক আগেকার টাকাকড়ি, মূর্তি, নানা জিনিস পত্তর। পুরোনো কালের একটা হাঁড়ির টুকরো পেলেও মানুষ সেটা জমিয়ে রাখে জাদুঘরে। এসব পুরোনো জিনিসপত্তরে জড়িয়ে থাকে অনেক দিনের অনেক কথা। যদি সেসব মূর্তি, ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি আত্মকথা শোনাতে পারত তা হ'লে তোমরা অনেক মজাদার গল্প শুনে খুশি হ'তে পারতে। কিন্তু ওরা কথা বলতে পারে না তোমাদের মতো। তাই অষ্টপ্রহর চুপ ক'রে থাকে। মানুষ ওদের কথা শুনতে চায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, অথচ ওরা মুখ খোলে না!

তবু মানুষ নাছোড়বান্দা। ওরা কথা না বললে কী হবে, যাঁরা ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন, পড়েন ইয়া মোটা মোটা বই, যাঁদের চোখ আছে দেখার মতো, ওঁরা কিন্তু সেসব পুরোনো কালের জিনিসগুলো দেখে জেনে নেন অনেক কথা। তারপর বই লিখে আর সবাইকে জানিয়ে দেন মজার মজার কথা সব। পুরোনো কালের দরদালান, মূর্তি, ঘটিবাটি ইত্যাদি দেখতে ভারি ভালো লাগে আমার। তোমাদের লাগে না? লাগে নিশ্চয়ই। যারা দ্যাখোনি, তারা জাদুঘরে এলেই দেখতে পাবে সব।

আগেই বলেছি, গোড়াতেই, চলতি পথে অনেক কিছুর ওপর চোখ বুলোনো আমার কাছে খুব খুশির ব্যাপার। যেন একটা উৎসব। তাই রাস্তার এক পাশে দাঁড়ানো গাছটাকে মনে হয় পরী, এক্ষুণি যে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যাবে মেঘের রাজ্যে; বাঁশের পুলটাকে ধনুকের মতো লাগে, কেমন টানটান, আলোর ঝাঁটার মতো মনে হয় পানির ফোয়ারা। দিঘির পদ্মগুলোতে, পথ চলতে দেখি, কতগুলো ফুলো-ফুলো, তুলতুলে গালঅলা ছেলেমেয়ে বসে আছে, মুখজাগা, গলা-ডোবা, ভালো লাগে এতসব কিছু যে লিস্টি তৈরি করলে কর্ণফুলি কাগজের কারখানায় হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে!

যাকগে, একদিন হ'ল কি, কেউ-নেই-রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গেছি, শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। ততক্ষণে সন্ধ্যা এসে পড়েছে মাথায় অন্ধকারের টোপর প'রে। ধুলো-ভরা পা-জোড়া প্রায় খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল আর কি! আমার তো আর ডানাঅলা ঘোড়া পক্ষিরাজ নেই যে, তুলো-তুলো ফুলো মেঘে-মেঘে উড়ে বেড়াব, সফর করব আকাশ থেকে আকাশে! খানিক জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে গাছতলায় গেলাম। গাছতলায় ডানাঅলা ঘোড়া বাঁধার ঝামেলা নেই। সটান শুয়ে পড়লাম মাটিতে। অন্ধকার আম্মার মতো আদর করলেন আমাকে, আমার সারা শরীরে হাত বুলিয়ে যেন ঘুম পাড়ালেন। আকাশে কিছু তারা, রুপোলি চকোলেটের মতো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, রাংতা-মোড়া। কিংবা জোড়া জোড়া দুষ্টুমি-ভরা চোখ। ঘাসের বিছানায় বেশ আরাম, কোত্থেকে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে রইলাম ঘাসে, আশেপাশে আর কেউ নেই, কোনো শব্দ নেই। কোনো-শব্দ-নেই জায়গাটার যেন মস্ত মুখ আছে, গুহার মতো দেখতে অবিকল। সেই মুখের ভিতর আমি শুয়ে আছি। কাছাকাছি যদি কেউ থাকত তবে সে জিগ্যেস করত অবাক হয়ে, "এই অবেলায় কেউ এমন সুনসান জায়গায় শুয়ে থাকে এভাবে?"

হঠাৎ কিছু শব্দ ভেসে এল কানে। শুনলাম, গানের মতো সুরেলা কিছু কথা দু'জনের। দুটো সুর। আলাদা আলাদা। কিন্তু দুটো মিলিয়ে ঝিলমিলিয়ে-ওঠা

কয়েকটি কথা। আমি কান পেতে শুনলাম। মানুষের মুখের ভাষার মতো অনেকটা, কিন্তু মানুষের ভাষা নয়। পাখিরও নয়। তা হ'লে কার ভাষা? মানুষের ভাষা আর পাখির কাকলি একটা পাত্রে একত্রে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে যে অন্য একটি ভাষার জন্ম হবে—ঠিক সেই ভাষায় কথা বলছে দু'জন। আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম ওদের কথাবার্তা। ওপরে, গাছের ডালে চোখ পড়তেই দেখি দুটো পাখি। দেখেই চিনতে পারলাম। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি। ব্যাঙ্গমি বলল, "ব্যাঙ্গমা একটা গল্প বলো-না!" ব্যাঙ্গমা শুরু করল তার গল্প, সুরেলা গলায়, আস্তে-আস্তে, রূপকথার আশ্চর্য আলোজ্বলা গাছতলায়, "একদা এক রাজ্যে রাজা ছিল, আর ছিল তার দুই রানি, দুয়োরানি, সুয়োরানি। হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া। আর ছিল সেপাই সান্ত্রি, পাইক বরকন্দাজ"—এটুকু ব'লেই যেন ব্যাঙ্গমা হাঁপিয়ে উঠল। ওর মুখে অন্য কোনো কথা ফুটল না।

ব্যঙ্গমা একটা গল্প বলো না ?

কিছুক্ষণ থেমে সে বলল, "দুত্তোর, সেই একই গল্প বলতে মোটেই ভালো লাগছে না আমার। সেই রাজরাজড়ার কাহিনী কত শোনাব আর? গল্প বলার চেয়ে শুনতেই ভালো লাগবে বেশি। আচ্ছা ব্যাঙ্গমি, আজ তুমিই একটা গল্প বলো, প্রাণ ভ'রে শুনি।"

ব্যাঙ্গমি বলল, "না গো না, আমি গল্প শোনাতে পারব না। আমি গল্পটল্প জানিনে। তুমি যা শোনাও তা-ই শুনি। নিজের বলা গল্প তো আর তুমি শুনবে না।"

ব্যাঙ্গমার মন বেজার, মুখটা কেমন কালো কালো লাগল। আমার কেমন মায়া হ'ল। আমি বললাম, গাছতলা থেকে, "ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, আমার গল্প শুনবে তোমরা?"

'কী তোমার পরিচয়?'—ভেসে আসে ব্যাঙ্গমার গলার আওয়াজ।

"ছড়া কাটি, কবিতা বানাই।" বললাম হেসে হেসে।

"আর?"

"ভালোবাসি আমার শহরকে, যেখানে আমি জন্মেছি।"
"সেই শহরের গল্প শোনাতে পারবে তুমি?"
"চেষ্টা করে দেখতে পারি।"
"তোমার গল্প শুনতে রাজি আছি আমরা।"
"তবে বলি শোনো—"

দুই

শহরের নাম ঢাকা। এ-শহরে একটা সরু গলিতে যখন আমি প্রথম চোখ খুলেছিলাম তখন ঢাকা ছিল কেমন ফাঁকা ফাঁকা। এত দরদালান ছিল না, বাস ছিল না, মোটর ছিল না, এমনকি রিকশাও ছিল না, রাস্তায় রাস্তায় ছিল না সারি সারি পিঁপড়ের মতো মানুষের ভিড়। ছিল ছোট ছোট পথ, একটি কি দু'টি বড় রাস্তা ছিল। ছিল অনেকগুলো গলি, সেসব চুলের ফিতের মতো গলির ভেতর ছিল জনমনিষ্যির বসতি।

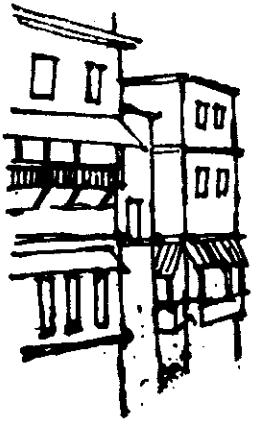

পাড়ায় পাড়ায় ঘাস-বিচালির গন্ধ ছড়ানো আস্তাবল ছিল, আর ছিল ঘোড়ার গাড়ি। গাড়োয়ানের চাবুক ঝিকিয়ে উঠত হাওয়ায়, রোদ্দুরে। কাছে-দূরে মজাদার শব্দ ক'রে ঘোড়া ছুটত দিগ্বিদিক—খট্ খট্ খট্ গাড়োয়ান লাগাম নেড়ে বলত—হট্ হট্ হট্।

গাড়োয়ানের চাবুক ঝিকিয়ে উঠতো.....

আমি যে-পাড়ায় জন্মেছি তার নাম ছিল খুব সুন্দর মাহুতটুলি। অনেক অনেক আগে হয়তো শুধু মাহুতদের বসবাস ছিল পাড়াটায়, সেই রাজা-বাদশাহদের আমলে। মাহুতটুলিতে কিন্তু আমি কোনো হাতিশালা দেখিনি, হাতি দেখিনি, হাতির হাওদা দেখিনি, দেখিনি মাহুত—সেই যারা হাতি চালায়। মাহতটুলির যে-গলিতে থাকতাম সেখানে ছিল না সোনার গাছ, যে-গাছে ফলে থোকা থোকা হীরের ফল। ছিল না সোনার দাঁড়ে-বাঁধা হীরামন তোতা। টলটলে ফোয়ারা ছিল না কোনো, যার রুপোলি পানির ছিটায় পাথর হয়ে যাবে টুকটুকে রাজপুত্তুর। সেই সোনার ছেলে সব যারা ঘর ছেড়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে

পড়েছিল আশ্চর্য ফুলের খোঁজে। মাহুতটুলির গলিতে পালঙ্ক ছিল না, সোনা-রুপোর কাঠি ছিল না, ছিল না ঘিয়ের প্রদীপ। কিন্তু ছিল একটা বাতি, গলির শেষ সীমায় দাঁড়ানো। রোজ সন্ধেবেলা কাঁধে মই ঝুলিয়ে আসত বাতিঅলা। তার গলায় মাদুলি, মাথায় কিস্তিটুপি, কাত ক'রে পরা। গায়ে তালিমারা ফতুয়া। খালি পা, হাঁটত হনহনিয়ে। আমি রোজ অপেক্ষা করতাম, কখন সূর্যিমামা পশ্চিম আকাশ থেকে তাঁর রঙিন গালিচাটা গুটিয়ে নেবেন, কখন ছায়া নামবে গলিতে। কারণ, সূর্যের আলো ফুরুলেই বাতিঅলা আসবে আলো জ্বালানোর খেলা খেলতে। গলির শেষ সীমার বাতিটায় আলোর ফুল ধরবে, নরম তুলতুলে আলোর ফুল। বাতিঅলা মই বেয়ে উঠবে, ফতুয়ার পকেট থেকে কী-একটা বের করবে, তারপর গলিতে আলোর কলি, যেন কোনো জাদুকর সন্ধের বোঁটায় ঝুলিয়ে দিয়েছে আলোর ফুল, আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে। তখন ইচ্ছে হ'ত বাতিঅলাকে ডেকে বলি ঃ

বাতিঅলা করছ তুমি
কী যে মজার কাজ।
পরিয়ে দিয়ে সাঁঝের গায়ে
আলো-জরির সাজ।

কিন্তু শখ ক'রে মনে-মনে বানানো কথাগুলো কখনো জানানো হ'ত না তাকে। শুধু দেখতাম ওকে, দূর থেকে জানালার শিকের ফাঁক থেকে, দেখতাম আলোর ফুল। চোখ জ্বলজ্বলে। কোনোদিন ওর কাছে যাইনি। ভয় হ'ত যদি আত্‌কা আমার মুখ থেকে এমন কোনো বোকা-বোকা কথা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে যা শুনে বাতিঅলার মেজাজ বিগড়ে যাবে, আড়ি দেবে সে আমার সঙ্গে, আর কোনোদিন আমাদের বাড়ি-ঘেঁষে-দাঁড়ানো বাতিটায় আলো জ্বালবে না সন্ধেবেলায়। সে হয়তো রাগ ক'রে আসবেই না আর আমাদের গলিতে। আর সে না এলে ছোট্ট গলিটা মুখ কালো ক'রে রাখবে সারা সন্ধেবেলা, রাতে হাসি ফুটবে না ওর ঠোঁটে। তাই চুপচাপই থাকতাম, শুধু দেখতাম চেয়ে চেয়ে। গলি বেয়ে ছায়া নামত, অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে আসত, দেখতাম; কিছু বলতাম না মুখ ফুটে। আলো ফুটত বাতিঅলার হাতের ছোঁওয়ায়, আলো ফুটলে সে খানিক মাথা নোওয়াত মই থেকে নামার আগে, একবার দেখে নিত কাচের ভেতরকার

আলোর পদ্মটাকে। কখনো মনে হ'ত, বাতিঅলা একেবারে মিশে গেছে বাতিটার গাছে, শুধু শূন্য মই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। এই খেলা কতদিন যে দেখেছি একা একা, জানালার সরু সরু শিকে গাল লাগিয়ে তার আর কোন লেখাজোখা নেই।

আলো জ্বালানোর খেলা সাঙ্গ করে বাতিঅলা যেত চ'লে কাঁধে মই ঝুলিয়ে, শরীর দুলিয়ে—যেন মিলিয়ে যেত হাওয়ায়। গলায় মাদুলি, মাথায় কিস্তিটুপি, কাত ক'রে পরা। তারপর ছেলে ঘুমোত, পাড়া জুড়োত। বিছানায় গা এলিয়ে দিলে কোনোদিন চট ক'রেই হাজির হতেন ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি। আমার নানির বাটাভরা পানের দিকে নজর না দিয়ে, পিঁড়ি ডিঙিয়ে, পালঙ্ক ছেড়ে নিরিবিলি ওঁরা এসে বসতেন আমার চোখের পাতায়। একজোড়া চোখে ওঁদের ছায়ারঙের আঁচল লুটিয়ে পড়লে টুপ ক'রে ডুব দিতাম ঘুমের নিঝুম সরোবরে। কোনো কোনো দিন আবার ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসির দেখা মিলত না অনেক রাত অব্দি। নানা ধরনের শব্দ হ'ত—খুট খুট, ঠক ঠক, মক মক, চিক চিক, ঝিক ঝিক, আরও কত শব্দ, বিদঘুটে, কুটকুটে সব শব্দ আর আমি খামোকা জব্দ হতাম বিছানায় শুয়ে-শুয়ে।

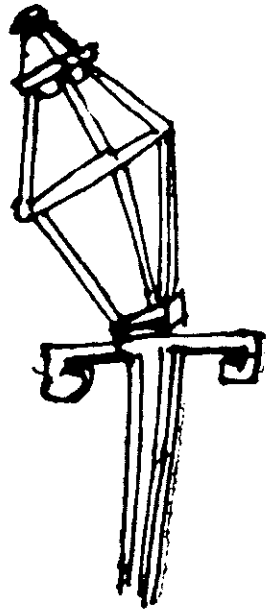

একসময় চেনা আওয়াজ বাজত হাওয়ায়, রাতের বুকে। আওয়াজটা উঠে আসত গলির কৌটো থেকে, যেন প্রাণ-ভোমরার শব্দ। পথ-হাঁটার শব্দ শুনতে পেতাম, শুনতে পারতাম শব্দগুলোকে এক এক ক'রে। জুতো-পায়ে কেউ গলি পেরুচ্ছে। জুতোর শব্দে অন্ধকারের কালো কালো কিছু মিহি রেশমি সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে, আমি শুনতে পেতাম। কান পেতে, বালিশে মাথা রেখে। আলীজান ব্যাপারি পাম্পশু-পায়ে গলি পেরুচ্ছেন, চলেছেন নিজের বাড়ির দিকে। বেশ রাত ক'রে বাড়ি ফিরতেন অলীজান ব্যাপারি। কোনো এক রাতে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে নানির কাছে এসে, বুক ঘেঁষে জানতে চেয়েছিলাম শব্দটা কিসের। নানি আমার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, আলীজান ব্যাপারির জুতোর শব্দ ওটা। একসময় আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেত তাঁর জুতোর শব্দ, গলি পেরুনো শেষ। আলীজান ব্যাপারির সাবান আর তামাকের দোকান ছিল মস্ত। দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরতেন তিনি অনেক রাতে। তাঁকে কোনোদিন পাজামা পরতে দেখিনি, কিংবা চোগা-চাপকান। কান-ঢাকা পাগড়িও পরতেন না তিনি। পরতেন লুঙ্গি, কখনো একরঙ্গা, সাদাসিধে, কখনো ডোরাকাটা, আর

পরতেন পাঞ্জাবি। সবসময় মাথায় গোল একটা টুপি থাকত কাপড়ের। পায়ে পাম্পশু। সারা মহল্লার কান খাড়া হ'ত তাঁর পাম্পশুর শব্দে। মহল্লার সর্দার ছিলেন তিনি, জবরদস্ত মানুষ। তাঁর এক ডাকে সবাই হ'ত হাজির, না এলে যেন জবাই ক'রে ফেলবেন তিনি, এমনি তাদের হাবভাব। বলতে হয়, দাপট ছিল আলীজান ব্যাপারির, তবে তাঁর জুলুমের কথা কিছু শুনিনি। করলেও সেসব বোঝার বয়েস হয়নি তখন।

আলো জ্বালানোর খেলা
সাঙ্গ করে বাতিঅলা যেত
চ'লে কাঁধে মই ঝুলিয়ে।

আলীজান ব্যাপারির দাপটে এক ঘাটে বাঘে-মোষে জল খেত কি না জানি না, তবে আমাদের বাড়ির পেছনেই ছিল একটা তালাও, কচুরিপানায় ভরতি। ঢাকার লোক পুকুরকে বলে তালাও। আমি কোনোদিন সেই পুকুরে নামিনি। মুরুব্বিদের বারণ ছিল। তাই পা বাড়াতে পারিনি তালাওয়ের দিকে। পাঁচকড়ি মিঞার বাড়ির পাশেই ছিল সেই তালাও। লোকে পুকুরটার নাম দিয়েছিল ভগতের গাড়া। এই নামকরণের পেছনে কোনো ইতিহাস আছে কি না জানি না। পাঁচকড়ি মিঞা ছিলেন বড়সড় লম্বা-চওড়া মানুষ। গালভরা গোঁফদাড়ি, তপসে মাছের মতো। যেন স্যান্টা ক্লজ তিনি। স্যান্টা ক্লজ কে জান তো? সেই যে

ভালোমানুষ বুড়ো—যিনি বড়দিনের উৎসবে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েকে আদর করে হাসির রঙে রাঙিয়ে এনে দেন অনেক উপহার। পাঁচকড়ি মিঞা আমাকে কোনো উপহার দেননি কখনো। তবু ওঁকে খুব ভালো লাগত আমার। তিনি যখন হাত নেড়ে-নেড়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কথা বলতেন কিংবা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন পুকুরটার সামনে,—আমি অবাক হয়ে দেখতাম তাঁকে। আমার নানার সঙ্গে ভাব ছিল তাঁর। তিনি প্রায় রোজই আসতেন নানার কাছে, গল্পসল্প করতে। বড় গল্পে ছিলেন ভদ্রলোক। পাঁচকড়ি মিঞা এলে নানাও খুব খুশি হতেন, দেখেছি। তিনি এলেই হুঁকোটা বাড়িয়ে দিতেন নানা, পাঁচকড়ি মিঞা গুড়গুড় ক'রে হুঁকো টানতেন আর খুলে দিতেন গল্পের ফোয়ারার মুখ। সত্যি বলতে কি, পাঁচকড়ি মিঞার চেহারা শাহি শাহি মনে হ'ত আমার কাছে, কিন্তু তাঁর একটা পা ছিল বিচ্ছিরি, বিকট ফোলা-ফোলা। অর্থাৎ পাঁচকড়ি মিঞার পায়ে ছিল গোদ। খোদ তিনি সজাগ ছিলেন তাঁর এই খুঁত সম্পর্কে, বুঝি তাই বারবার চেয়ে দেখতেন নিজের পায়ের অদরকারি অংশটুকু। নিজের পায়ের মাংসের এই বাড়াবাড়ি তিনি হয়তো মেনে নিতে পারেননি কোনোদিন।

আমাদের বাড়ির পাশে যে-দালানটা ছিল সেখানে থাকতেন এক দেশী সাহেব। ফরসা, বেঁটেখাটো মানুষ, বেশ চটপটে। ফুল ভালোবাসতেন ব'লে সুন্দর বাগান করেছিলেন। নানা ফুল ফুটত তাঁর বাগানে। নিজের গোঁফটার মতোই ছেঁটেছুঁটে রাখতেন বাগানের গাছপালা। নিজে দু'বেলা পানি ঢালতেন চারাগুলোর শিকড়ে, আর আপনমনে বিড়বিড় ক'রে কীসব বলতেন। একদিন ঢুকে পড়েছিলাম টমি সাহেবের দালানে। কেমন ছায়া-ছায়া, চুপচাপ বাড়ি। মনে হ'ত এ-বাড়িতে যারা থাকে, তারা যেন তুলো দিয়ে তৈরি কয়েকটা আজগুবি পুতুল। নড়েচড়ে, কথা বলে, কিন্তু আমাদের চেনাজানা কেউ নয়। বুঝি তাই ভয় হ'ত টমি সাহেবের বাড়ির ফটক পেরুতে, ঢুকতে সেই আদ্যিকালের দালানে। টমি সাহেবের কাছে ভিড়তেও ভারি ভয় হ'ত আমার। দূরে দূরে থাকতাম। শুধু একদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম তাঁর দালানের ভেতর। তারপর আর কোনোদিন যাইনি। টমি সাহেবের দালান পাহারা দিত তিনটে ভীষণ-দেখতে কুকুর। চোখে পড়লেই প্রাণ যেত উড়ে। ঘুরে দেখার সাহস হ'ত না আর। সেদিনের পর আর কোনোদিন যে টমি সাহেবের দালানমুখো হইনি, সেজন্যে সেই তিনটি ডাকাতপনা কুকুরই অনেকখানি দায়ী।

টমি সাহেবের দালানে একবারের বেশি যাইনি, কিন্তু আমাদের বাড়ির পাশের আরেকটা বাড়িতে গিয়েছি অনেকবার। দরদালান নয়, নড়বড়ে কোঠাবাড়ি। খাপাচির বেড়া, পুরোনো টিনের ছাদ। ছোটখাটো উঠোন। আধখানা উঠোন জুড়ে শব্রিআমের গাছ। সবুজ সবুজ খসখসে পাতা। পাতায়-পাতায় ফল ঠাসা। ডাঁশা-ডাঁশা। দেখলেই জিভে পানি আসে। বাতাসের ঝাঁকুনিতে পাতায় কাঁপুনি, ডালের

ফাঁকে সোনার জলের মতো আলো গড়িয়ে পড়ে। ফলগুলো চকচক করে আলোয়। ভালোয় ভালোয় একটি কি দু'টি হাতে এলেই খুশি। দুটো কুলের গাছও ছিল সেখানে। উঠোন আলো ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা শব্রিআমের গাছঅলা বাড়িটার মালিক ছিল একটা বুড়ি। থুত্থুরে নয় মোটে, কিন্তু বুড়ি বটে। লোকে তাকে ডাকত তেলওয়ালি বুড়ি ব'লে। একসময় তেল বেচত সে। তেল বেচেই দিন কাটত বুড়ির। একদিন কী খেয়াল হ'ল বুড়ির, তেলের কারবার বন্ধ করে পিঠে বেচতে শুরু করল হঠাৎ। খুব সকালে, যখন সবেমাত্র অন্ধকার পালাই-পালাই করছে, মোরগ বাগ দিচ্ছে, গাছে-গাছে কিচিরমিচির করছে কুটুমপাখি, তখন উনুনে আগুন দিত বুড়ি। একটু পরেই ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করত উনুনে চাপানো হাঁড়ি। তৈরি হ'ত চিতুয়া পিঠে, তোমরা যাকে বল চিতাই। কতদিন হাতমুখ না ধুয়েই হাজির হতাম তেলওয়ালি বুড়ির বাড়িতে একটি কি দু'টি পয়সা নিয়ে। চিতাই পিঠে কিনব, তারপর বাড়িতে ফিরে এসে মজা করে খাব বাসি শিমের তরকারি দিয়ে, মধু মিশিয়ে কোনোদিন। রাত কাবার হলেই ছোটো তেলওয়ালি বুড়ির বাড়িতে, বুড়ির হাঁড়িতে রাখো চোখ। মস্ত তারার মতো এক-একটা পিঠে ফুটে উঠত খোলায়। চালের গোলায় ঘুটুনি দিয়ে নাড়া দিত বুড়ি, চেয়ে দেখতাম; ছোট্ট খুরচুনি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খোলা থেকে পিঠে তুলত, চেয়ে দেখতাম; একটা পিঠের ওপর আরেকটা পিঠে চাপিয়ে তুলে দিত চেয়ে দেখতাম। পিঠে হাতে এলেই দাম চুকিয়েই দে দৌড়। বুড়ির কাছে শুধু পিঠেই পেতাম না, উপরি পাওনা ছিল কিছু। পিঠে তৈরি করতে-করতে গল্প বলত সে। শাহজাদা-শাহজাদির গল্প। বলত সেই গল্প, যে-গল্পে ঝাঁক ঝাঁক পক্ষিরাজ ঘোড়া এসে নষ্ট করে যেত রাজার ক্ষেতের সোনালি ফসল। পিঠে তৈরি হ'তে দেরি হ'লে তেলওয়ালি বুড়ি গল্প দিয়ে ভুলিয়ে রাখত আমাদের। যেমনি ভালো গল্প বলতে পারত তেমনি ভালো রান্না করতে পারত সে। বিশেষ ক'রে গরুর কল্‌জি রান্নার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। আব্বার জন্যে মাঝে-মাঝে গরুর কল্‌জি রেঁধে নিয়ে আসত বুড়ি। আব্বা একদিন খুব তারিফ করেছিলেন তার রান্নার, তাই সে সুযোগ পেলেই আব্বার জন্যে এটা-ওটা রেঁধে নিয়ে আসত। আমরাও ভাগ পেতাম একটু-আধটু। সত্যি বলছি, সেই কল্‌জির স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

তেলওয়ালি বুড়ি শুধু পিঠেই বানাত না, ঝুড়ি ভরে কুল শুকোত উঠোনে, টিনের ছাদে। শুকনো কুলের চমৎকার আচার তৈরি করে বেচত। আমি কখনো

সখনো ঝুড়ি থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে পাচার করতাম কিছু কুল। কোনো-কোনোদিন বুড়ির চোখে ধরা পড়ত আমার আনাড়ি হাতের চুরি, নকল রাগে বুড়ি গর্জে উঠত, তেড়ে আসত হাত নেড়ে। ওর মাথার শনের মতো চুল ফুঁসে উঠত, নাকের ঘুলঘুলি উঠত ফুলে, আমি কুল নিয়ে চম্পট।

কুলের কথা শুনে ব্যাঙ্গমির জিভে পানি এসে থাকবে হয়তো। বুঝি তাই সে আমার কাহিনীর মাঝখানে ফোড়ন দিয়ে বলে উঠল, "তুমি তো আচ্ছা শয়তান ছেলে ছিলে বাপু! গরিব বুড়ির কুল নিয়ে পালাতে। বুড়ির গাছের কুলগুলো খুব ভালো ছিল বুঝি, খুব মিষ্টি?"

"না, তেমন মিষ্টি ছিল না বুড়ির কুল, বেশ টক টকই ছিল। কিন্তু ঝুড়ি থেকে কুল নিয়ে চোঁচা দৌড় দিতে ভালো লাগত। তাছাড়া আমার দুষ্টুমিতে বুড়ি বিরক্ত হ'ত না। কতদিন নিজেই মুঠোমুঠো কুল তুলে দিয়েছে আমার হাতে। কিন্তু এভাবে কুল পেতে মোটেই ভালো লাগত না আমার। লুকিয়ে-চুরিয়ে কুল নিয়ে হুট করে পালাতে পারলেই খুশি হতাম বেশি। আর শোনো, বুড়ি কিন্তু পাখিদের

ভালোবাসত খুব। রোজ দুপুরে খেতে বসার আগে সে করত কি, দু'মুঠো তরকারি-মাখানো ভাত দরজার ওপরের দিকে ঝুলে-থাকা টিনে ছিটিয়ে দিত—যাতে পাখি এসে খেতে পারে। বেশির ভাগ খাবার কাকের পেটেই যেত; কারণ, কাকের জ্বালায় অন্য কোনো ভালোমানুষ পাখি সে-তল্লাটে ভিড়তে পারত না। তোমরা বুড়ির বাড়িতে গেলে সে ভারি খুশি হ'ত কিন্তু, দু'মুঠো ভাত বেশি দিত সেদিন।"—ব্যাঙ্গমিকে বললাম গাছতলায় শুয়ে-শুয়ে। হীরের মতো জ্যোৎস্না-জ্বলা চোখ তুলে ব্যাঙ্গমি ব্যাঙ্গমাকে বলে, "শুনলে তো তেলওয়ালি বুড়ির কথা? ওরকম একটা বুড়ির দেখা মিললে মন্দ হয় না, কী বলো? দু'বেলা আহার জুটে যেত সহজে।" ব্যাঙ্গমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়, "আজ আর সেই বুড়ি নেই, তার কুলের ঝুড়িও নেই। লোকে এখন নিজেই খেতে পায় না, পশুপাখিকে খাওয়াবে কী?"

মনে হ'ল, ব্যাঙ্গমার কথা শুনে ব্যাঙ্গমির মন-খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ ব্যাঙ্গমির মুখে আলো ঝলসে ওঠে, "ভাগ্যিস আমাদের খুদ-কুড়ো কিংবা ভাত-তরকারি খেতে হয় না।"

"যাকগে, এবার তোমার শহরের গল্প বলো, শুনি"—ব্যাঙ্গমা সুরেলা কণ্ঠে অনুরোধ করে আমাকে। গল্প বলার জন্যে গাছতলায় নড়েচড়ে উঠি আমি। হঠাৎ হাওয়া ফুঁড়ে একটা শব্দ হ'ল। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি কান খাড়া করে। আমিও।

দেখেছি মেঘের খেলা কিংবা ঘুড়ির মেলা

তিন

শব্দটা শুনে আমি চমকে উঠেছি, ব্যাঙ্গমা লক্ষ করল। কোথাও জনমনিষ্যির সাড়া নেই। গাছতলায় আমি একা। গাছের ডালে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিল। পা'টা টেনে বসলাম। কী করব ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাকে উসখুস করতে দেখে ব্যাঙ্গমা বলে, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওটা পাখির পাখা

ঝাপটানির শব্দ।" ভয় পেয়েছি এটা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি জানুক তা আমি চাইনে। জেনে ফেললে ভয়ানক জব্দ হব। ভাববে, আমি বড্ড ভীতু। আর যা-ই হোক, একজোড়া পাখির কাছে আমি ভীতু বনতে নারাজ। তাই একটু বাড়তি বাহাদুরি দেখিয়ে গাছে মাথা ঠেকিয়ে বললাম, "মোটেও ভয় পাইনি আমি।"

"বেশ বেশ, এবার তোমার গল্প শুরু করো।" ব্যাঙ্গমা বলে।

তোমরা তেপান্তরের মাঠ দেখেছ, সেই যেখানে রাজপুত্তুরের ঘোড়ার খুরে ধুলো ওড়ে, আর সোনালি ধুলো পশ্চিম আকাশের রাঙা আলো আর ভাঙা-ভাঙা মেঘে মিশে যায়। তাই তোমাদের তেপান্তরের মাঠের কথা বলব না। হয়তো আরও অনেক মাঠ তোমরা দেখেছ উড়ে যেতে-যেতে। ওসব মাঠের কথাও বলব না। তবে যে-মাঠটার কথা বলব, সেখানে হয়তো তোমরা যাওনি কোনোদিন। মাঠটা তেমন বড় নয়, কিন্তু টিয়েপাখির ডানার মতো সবুজ ছিল তার ঘাস। বেশ সমান-সমান করে কাটা। ইচ্ছে হ'লে জুতোগুলো খুলে খালি পা'টা ঘষে নাও খানিক, তারপর হাঁটা শুরু করে দাও। মাঠের সঙ্গেই একটা ইশকুল। ইশকুলের মালী যত্ন করে ঘাস কাটে মাঠের, তাই এত ঝকঝকে, তকতকে—দেখলেই চোখ জুড়োয়। এই মাঠে আমরা ছুটে বেড়াতাম, আমরা ক'জন ছোট ছোট ছেলে। কখনো ফুটবল, কখনো গোল্লাছুট, কখনো আবার এমনিতেই ছোটাছুটি।

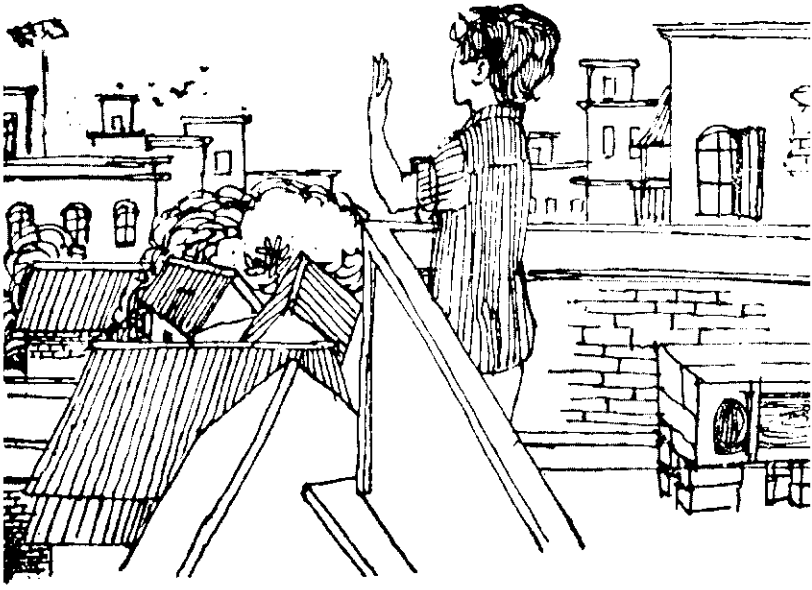

কিন্তু সেই ইশকুলের ছাত্র ছিলাম না আমি। আমি পড়াশুনো করেছি অন্য একটা ইশকুলে। সে-ইশকুল ছিল অন্য পাড়ায়, আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে। যে-ইশকুলে আমি পড়তাম না অথচ যার লাগোয়া মাঠে ছোটাছুটি করতাম সেটা ছিল আমাদের মহল্লার খুব কাছে। দু'মিনিটের রাস্তা। মাহুতটুলি আর আরমানিটোলার মাঝামাঝি একটা জায়গায় ছিল লাল ইটওয়ালা সেই ইশকুল। সেখানে বই নিয়ে আসা-যাওয়া না করলে কী হবে, আমার কিন্তু খুব ভালো লাগত ইশকুলবাড়িটাকে। অতল পাতালের কোনো বাড়ি দেখিনি। নানির মুখে যেসব গল্প শুনতাম রাতে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেসব গল্পের কোনো-কোনোটায় পাতালের বাড়িঘরের কথা থাকত। যখন কখনো-সখনো পাতালের দরদালানের কথা ভাবতাম, তখন কেন জানি সেই লাল ইটওয়ালা ইশকুলবাড়িটা নিজের ঠাঁই করে নিত সেগুলোর ভিড়ে। হয়তো চুপ করে ব'সে আছি ছাদের ওপর, দেখছি মেঘের খেলা কিংবা ঘুড়ির মেলা। মেঘ কিন্তু ভারি মজার খেলা জুড়ে দিত আকাশের নীল মস্ত উঠোনে। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় না, অথচ খেলা দেখে যাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মনটা নেচে উঠবে খুশিতে। ভালো করে চেয়ে দ্যাখো, ঐ ঘুসি পাকিয়ে আসছে ইয়া বিরাট এক দৈত্য। তারপর হঠাৎ বিরাট দৈত্যটা কোথায় যায় মিলিয়ে, তার জায়গায় হাজির হয় কেশর-দোলানো এক শাদা ঘোড়া, তার পিঠে পাগড়ি-পরা, কোমরে তলোয়ার-ঝোলানো সওয়ার একজন। ঘোড়া ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই পাগড়িটা মুহূর্তে হয়ে যায় কোনো মোগল বাদশার মুখ। বাদশার মুখ বদলে গিয়ে হয় ফুল, ফুল তাজমহল, জলমলে মস্ত মুক্তো, মুক্তোর সরোবর, সরোবর পাহাড়, পাহাড় ডাঁই ডাঁই শাদা হাড়, হাড় সেই ইশকুলবাড়ি। রং বদলাল এবার। ধোঁয়াটে শাদা রং ইশকুলবাড়িটার। অথচ সে-ইশকুলে পড়িনি আমি কোনোদিন। কিন্তু প্রায় রোজই যেতাম সেখানে, রোজ বিকেলে, লাল ইটের শোভার লোভে, মাঠের লোভে।

কোনো-কোনোদিন সকালেও যেতাম। ইশকুলটার পেছনে ছিল কিছু শিউলি ফুলের গাছ। সকালে এসে দেখতাম, ফুলে ছেয়ে গেছে শিউলিতলা। মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিতালি করছে সারাক্ষণ। গাছগুলোর কাছেধারেই বসতাম। কখনো-বা কুড়িয়ে নিতাম কিছু ফুল বাড়ি নিয়ে যাব ব'লে। শিউলিতলায় একাই যেতাম আমি। আমাদের বাড়ির অন্য কোনো ছেলেপেলে আমার সঙ্গে আসত না। কিন্তু আমার অচেনা কিছু ফুটফুটে ছেলেমেয়ে আসত সেখানে ফুল কুড়োতে। কারও কারও হাতে থাকত সাজি। অনেক ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যেত ওরা।

ফুলে ছেয়ে গেছে শিউলিতলা।

একদিন ওদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সাজি ভরে এত ফুল নিয়ে ওরা করে কী। একটি ছেলে জবাব দিল, ঠাকুরের পূজোর জন্যে ফুলের দরকার হয়। শুধুই কি শিউলি? হরেকরকমের ফুল দিতে হয় ঠাকুরকে। তাই ওরা ফুল কুড়োতে আসে রোজ।

কোনো ঠাকুরকে ফুল দেবার দরকার ছিল না আমার। তবু আমি ফুল কুড়োতাম মুঠো ভরে, শার্টের কোঁচড় ভরে। সে-ফুলের কিছু চাপা পড়ত বইয়ের পাতায়, খাতায় আর কিছু লুট ক'রে নিত ছোট ভাইবোনের দল। কেউ-কেউ মালা গাঁথত শিউলি দিয়ে। আমার ফুলের সাজি ছিল না ব'লে কখনো কখনো মন-খারাপ হয়ে যেত। বাড়িতে কারুর কাছে সাজির বায়না ধরার সাহস পর্যন্ত হ'ত না। তাছাড়া চোখে দেখলেও ঐ জিনিসটার নাম যে সাজি তা আমার জানা ছিল না তখন। দেখে এত্ত ভালো লাগত যে ইচ্ছে হ'ত হাতে তুলে নিই। কিন্তু অচেনা ছেলেমেয়ের কাছে তো আর ঝট্ ক'রে কোনো জিনিস চেয়ে বসা যায় না! তাই ছেলেবেলায় ফুলের সাজি আমার হাতে আসেনি কখনো। ফুলের সাজি থাক বা না-থাক, সোনালি জলের মতো টলটলে আলো-ভরা সকালবেলায় শিউলিতলায় ঘুরে বেড়ানোর খুশিটুকু তো ছিল। এইগুলোর মাত্রা একটু বেশি ছিল বলেই হয়তো সাজি না থাকার দুঃখ তলিয়ে যেত কোথায়।

যে-লাল ইটওয়ালা ইশকুলটার কথা বলছি তার পাশেই একটা মসজিদ। খুব সুন্দর, অনেক দূর থেকে এসে দেখার মতো। বিকেলে, সন্ধ্যায়, কি জ্যোৎস্নারাতে—যখনই দাখো-না কেন ভালো তোমার লাগবেই। মসজিদটার সারা গায়ে একরাশ তারা ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এর নাম সিতারা মসজিদ।

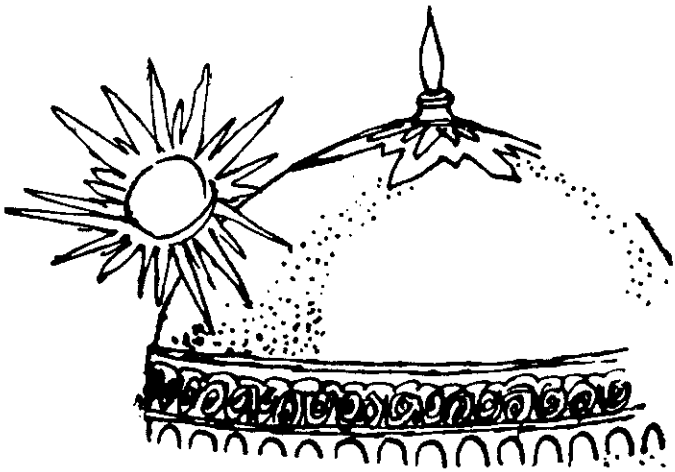

শেষ হাসিটুকু যখন ঝরিয়ে দিতেন .....

কিন্তু অনেক অনেক আগে এর নাম ছিল আলাদা। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মসজিদটা বানিয়েছিলেন মির্জা গোলাম পীর। তাই অনেককাল ধরে একে মির্জা গোলাম পীরের মসজিদ ব'লেই চিনত সবাই। তখন মসজিদটা অন্যরকম

ছিল। এত জ্বলজ্বলে ছিল না, ছিল না তারায়-তারায় ছাওয়া। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আলীজান ব্যাপারি পুরোনো মসজিদটাকে নতুন ক'রে তুলেছিলেন। ঢের টাকাকড়ি খরচ ক'রে জাপানি আর বিলেতি নকশা-করা চীনেমাটির টালি আনিয়েছিলেন তিনি মসজিদের জন্যে। মনের মতো ক'রে তারায়-তারায় সাজিয়ে তুললেন মসজিদ। দেখতে-দেখতে মসজিদের ভেতরে-বাইরে ফুটে উঠল চোখ-জুড়োনো শোভা। কোন আলীজান ব্যাপারি? সেই যে অনেক রাতে পাম্পশুর খট খট শব্দ করে মাহুতটুলির গলি পেরুতেন তিনি? সাবান আর তামাকের মস্ত দোকান ছিল যাঁর? হ্যাঁ, সেই আলীজান ব্যাপারির হাতেই আঠারো শতকের পুরোনো মসজিদ পেল নতুন রূপ। আর সে কী রূপ! কতদিন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থেকেছি ওর গম্বুজের দিকে। সূয্যিমামা অন্ধকার গুহায় লুকোনোর আগে তাঁর শেষ হাসিটুকু যখন ঝরিয়ে দিতেন সিতারা মসজিদের গম্বুজে, তখন মনে হ'ত গম্বুজগুলো যেন মস্ত পাখি, সোনালি নদীতে নেয়ে উঠেছে, এক্ষুণি পাখা মেলে

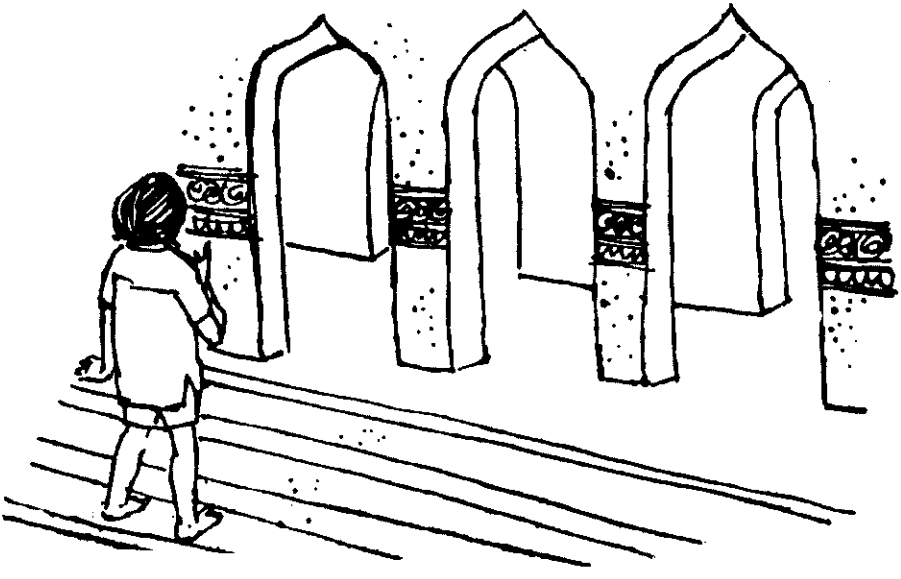

উড়তে শুরু করবে আবার। কখনো-কখনো আবার একঝাঁক কবুতর এসে বসত মসিজদের গম্বুজে। শাদা, কালো, খয়েরি, ধূসর—কত রঙের পায়রা। গম্বুজে-গম্বুজে ছড়ানো। গোধূলির জবাফুলের মতো আলো, কবুতরের জলসানি, মসজিদের তারা—এই সবকিছু কেমন ঘোর লাগিয়ে দিত চোখে। অবাক হয়ে

দেখতাম, কবুতরগুলো গলা ফুলিয়ে, মাথা দুলিয়ে চলাফেরা করছে গম্বুজ থেকে গম্বুজে। কখনো একসঙ্গে জড়ো হচ্ছে, কখনো আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। কখনো মনে হয়, ওরা যেন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল, আবার কখনো মনে হয়, একজন দরবেশ মসজিদের গম্বুজে ছিটিয়ে দিচ্ছেন রূপোলি পানি আর সেই পানির ফোঁটা থেকে জন্ম নিচ্ছে নানান কবুতর।

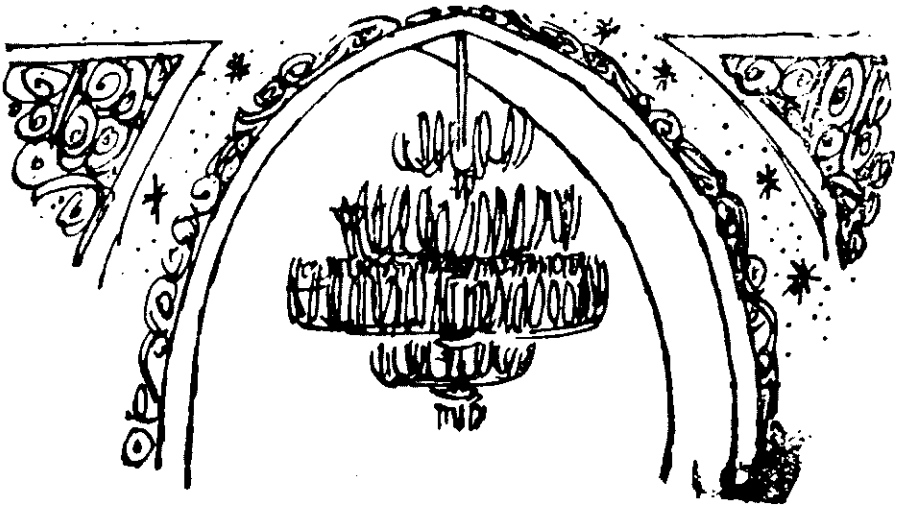

চোখ দুটো ঘুরে বেড়াতো মসজিদের দেয়ালে, খিলানে।

লাল ইটওয়ালা ইশকুলের মাঠে খেলতে খেলতে যখন হয়রান হয়ে পড়তাম তখন যেতাম সিতারা মসজিদে। মসজিদের চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে হাত-পা ধুতাম খাতিরজমা। অনেকক্ষণ ধ'রে। হাত-পা ধোয়াটা ছিল অছিলা মাত্র। আসলে মসজিদের চৌবাচ্চা আমাকে কাছে টানত। কারণ, চৌবাচ্চায় খেলা করত অনেকগুলো রঙিন মাছ। কতদিন চৌবাচ্চার পানিতে হাত ডুবিয়ে রেখেছি, যদি কোনো ফাঁকে রঙিন মাছ ধরে ফেলতে পারি, এই আশায়। কিন্তু মাছগুলো কী করে যেন আমার মতলব বুঝে ফেতল। তাই আমার হাতের কাছেই ঘেঁষত না ওরা। দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াত।

রোজার দিনে সন্ধ্যার সময় বেশ মজা হ'ত। তখন যারা মসজিদে থাকত তারা পেত ইফতারি। মুড়ি, ফুলুরি, দোভাজা, ছোলা, বেগুনি ইত্যাদি মিশিয়ে

দেয়া হ'ত সবাইকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ইফতারি পেত। আমার ভারি লোভ হ'ত মসজিদের ইফতারি খেতে। ছেলেমেয়েরা আজান হওয়ার আগে থেকেই হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দিত কে কার আগে নেবে, এ নিয়ে রীতিমতো একটা হুলস্থূল বেধে যেত। ইচ্ছে হ'ত, আমিও ছুটে যাই, জুটে যাই ওদের দলে। মুসল্লিরা সামনে ইফতারি সাজিয়ে ব'সে রয়েছেন মসজিদের বারান্দায়, কান খাড়া রেখেছেন আজানের জন্যে। হাজার লোভ হলেও, জিভে পানি এলেও, ইফতারির জন্যে হাত পাতা সম্ভব ছিল না আমার। কেমন বাধো-বাধো ঠেকত। তাই আধো আলো, আধো অন্ধকার মনে খালি হাতেই বাড়ি ফিরতাম। বাড়িতে ইফতারির সরঞ্জামের অভাব ছিল না, কিন্তু চোখ প'ড়ে থাকত সিতারা মসজিদের বারান্দায়। শুধু মনে হ'ত, ঐ মুড়ি, ফুলুরি, দোভাজা, ছোলা আর বেগুনি-মেশানো খাবারটা যেন রূপকথার দেশ থেকে এসেছে, আমাদের রোজকার দেখা ধরা-ছোঁয়াওয়ার বাইরের জিনিস।

হঠাৎ ফোড়ন কাটে ব্যাঙ্গমা, "মসজিদের ভেতর যেতে না তুমি?"

যাব না কেন? যেতাম নতুন কাপড় প'রে আব্বার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে। সে কি আজকের কথা? সারি সারি লোক দাঁড়িয়ে পড়ত খোদার দরবারে,

সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে সিজদা দিত মসজিদের ঠাণ্ডা মেঝেতে। চমৎকার ঠাণ্ডা! নাক, কপাল, হাতের তালু আর পায়ের পাতা সেই ঠাণ্ডার আদর খেত বেশ কিছুক্ষণ। সূরা মুখস্থ করানো হয়েছিল আমাকে। বেশ কয়েকটা সূরা জানা ছিল আমার। নামাজ পড়ার নিয়ম-কানুনও একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু সত্যি কথাটা বলেই ফেলি, সিতারা মসজিদের ভেতরে ঢুকে সূরা ভুলে যেতাম বিলকুল। আমার চোখ দুটো ঘুরে বেড়াত মসজিদের দেয়ালে, খিলানে। দেয়ালে-দেয়ালে গোলাপ ফুল। চীনেমাটির টালির ওপরে নকশা-আঁকা ফুল। দেয়ালে শুধু ফুলই ছিল না, সুন্দর লতাপাতাও ছিল। সবই নকশা। কিন্তু জনমনিষ্যির নকশা ছিল না, এমনকি পাখপাখালিরও নয়। ঈদের দিন ছাড়াও কোনো কোনো শুক্রবার আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন সিতারা মসজিদে। নামাজ শেষ হয়ে গেলেও আব্বা বেশ কিছুক্ষণ বসতেন মসজিদের ভেতর। দোয়া-দরুদ পড়তেন নীরবে। আমি বসে থাকতাম তাঁর পাশে। চেয়ে চেয়ে দেখতাম ফুল, লতাপাতা, আর মাথার ওপরে ঝুলে-থাকা বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন। কী যে ভালো লাগত আমার এলোপাতাড়ি চেয়ে দেখতে মসজিদের দেয়ালে-দেয়ালে ফুল, লতাপাতা, বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন—চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করত না। আব্বার মৃদু ডাকে মনে পড়ত, এবার যেতে হবে। তাই একসময় ফুরুত সিতারা মসজিদের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মেঝেতে ব'সে আমার সেই দেখা-দেখা খেলা। ঝাঁঝাঁ দুপুরবেলা আব্বার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রওনা হতাম বাড়ির দিকে। দেখতাম, ঐ কিছুদূরে পাম্পশু জুতোর খট খট শব্দ ক'রে হেঁটে চলেছেন বেঁটেখাটো আলীজান ব্যাপারি, মনে হ'ত সিতারা মসজিদেরই একটা মস্ত তারার মতো।

চার

বুকটা দুরদুর করছিল। তখন বেলা দুপুর, অথচ চারদিকে কেমন অন্ধকার। একটা ভেজা কালো শাল মেলে দিয়েছে কেউ। হুড়মুড় করে ছুটে গেল ওরা। কয়েকটি ছোট ছেলে। যেন উড়ে গেল কয়েকটি রঙিন বেলুন। আমি উঠছি নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। সঙ্গে অভিভাবক। হাঁটছি তাঁর হাত ধরে। ভালো করে সবকিছু চেয়ে দেখব তার জো নেই। পড়ো-পড়ো কাঠের সিঁড়িটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম সেই মুহূর্তে। একটু বেশি হুঁশিয়ার হয়েই পা ফেলছিলাম আস্তে-আস্তে। সারাক্ষণ ভয় হচ্ছিল, যদি কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে হঠাৎ। শেষ পর্যন্ত কিন্তু কাঠের সিঁড়ি বেশ ঠাটের সাথেই দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়।

কাঠের সিঁড়িটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম .....

সিঁড়ি পেরিয়ে ঘর। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। মনে হ'ল, কুলফির ভেতর সেঁধিয়ে গেছি। দু'একটা স্বর ভেসে এল কানে। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। দেয়ালে মস্ত একটা তেলছবি। সাহেবি পোশাক পরা গোঁফঅলা এক ভদ্রলোক। বইভরা ছোট্ট একটা টেবিলে হাত রেখে দাঁড়ানো। অভিভাবক তেলছবিটা দেখিয়ে বললেন, "ইনি মিস্টার পোগোজ। এঁর নামেই ইশকুলের নাম।"

কেরানিবাবু আমার নাম লিখলেন খাতায়। লেখার আগে আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। পরখ করলেন হয়তো। এর ফাঁকে একবার দৃষ্টিটাকে ছুটিয়ে দিলাম পাশের ঘরে, যেখান থেকে ভেসে আসছিল দু'একটা স্বর। কোনোটা বাজখাঁই, কোনোটা ধিমে শান্ত। দেখলাম কয়েকজন ব'সে আছেন চেয়ারে। কারও মাথায় কালো চুল, কারও শাদা-কালো, কারও-বা একদম শাদা। কারও মাথায় আবার ধূ-ধূ মাঠের মতো মস্ত টাক। ওঁদের সামনে একটা বড় টেবিল। টেবিলের ওপর কিছু ঝানু বেতও চোখে পড়ল। তক্ষণি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ততক্ষণে খাতায় নাম উঠে গেছে আমার। ভরতি হলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে। অবশ্য এর আগে ক্লাসে দাখিল হওয়ার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি আমার পেটে আছে কি না তার প্রমাণ দিতে হয়েছে পরীক্ষার খাতা লিখে। কাকের ছা বকের ছা কী-যে লিখেছিলাম সেদিন, আজ তার বিন্দুবিসর্গটুকু মনে নেই আর।

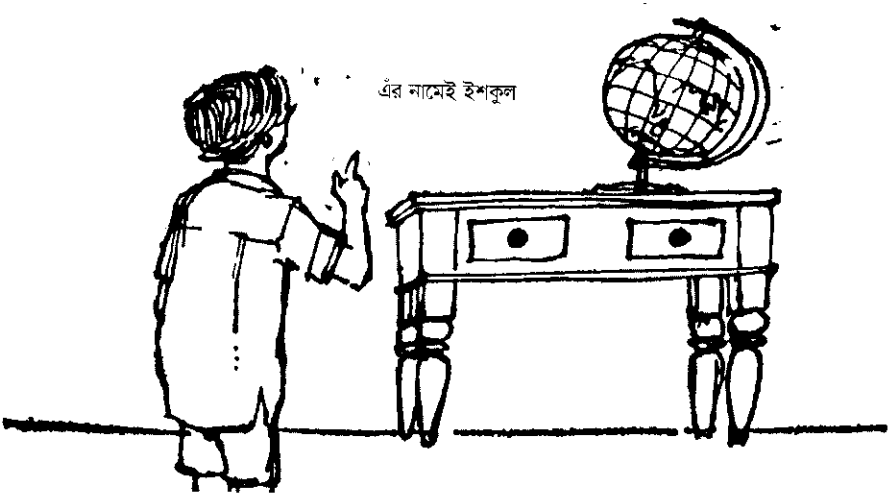

প্রথম দিনে ক্লাসে ঢুকেই ভড়কে গিয়েছিলাম মনে পড়ে। অভিভাবকটি আমাকে ক্লাসের দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েই খালাস। আমি হাঁটিহাঁটি পা-পা এগিয়ে গেলাম ক্লাসের ভেতর। আমাদের খাঁচার পাখিটা একদিন খাঁচা ছেড়ে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু পালাবে কোথায়? অনেকদিন খাঁচার ভেতর থেকে থেকে ওড়াটাই ভুলে বসেছিল সে। তাই কেমন বেকুবের ঢঙে হাঁটতে চেষ্টা করল বারান্দায়। আর ওড়ার আগেই আবার ধরা প'ড়ে গেল, আবার ওকে পোরা হ'ল খাঁচার ভেতরে। আমাকে নিশ্চয়ই তখন আমাদের সেই পাখিটার মতো মনে

হচ্ছিল। ক্লাসের ভেতর পা রাখতেই দেখলাম একটি ছেলে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে। আরেকজন বসে আছে মাটিতে হাঁটু মুড়ে মাস্টারমশায়ের টেবিলের সামনে। মাস্টারমশায়ের চোখে চশমা, হাতে বেত। বেত দেখে মনে হ'ল ওটা ঢের তেল শোষণ করেছে অনেক দিন ধ'রে আর অনেক ছেলের গায়ের চামড়ার

ক্লাসের ভেতর পা রাখতেই .....

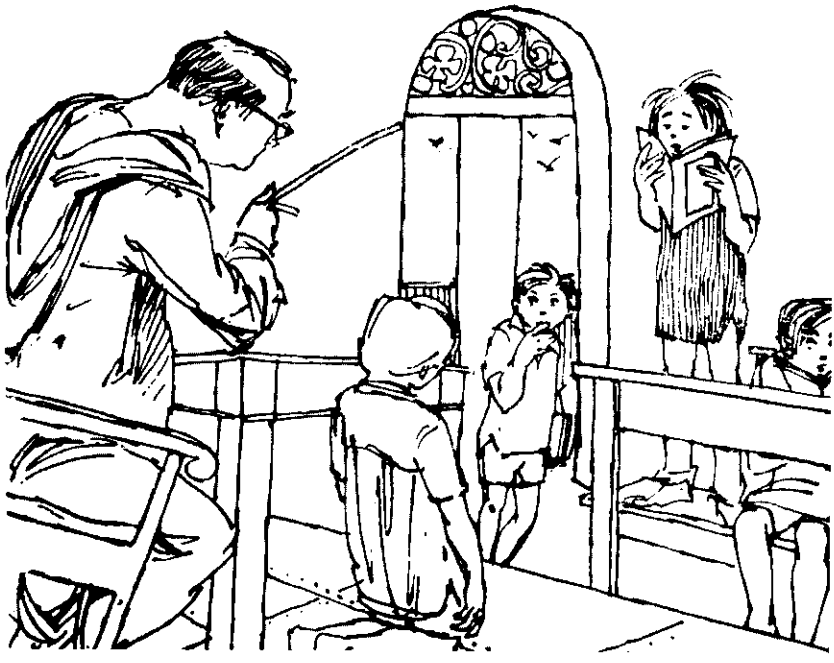

সঙ্গেই নিত্যি নিত্যি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে ওর। কোথায় বসতে হবে, মাস্টারমশায় বেত উঁচিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন আমাকে। আমি সুবোধ বালকের মতো সেই জায়গায় ব'সে পড়লাম। আমার ওপর অনেকগুলো চঞ্চল চোখ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল একসঙ্গে। ওদের চাউনি দেখে মনে হ'ল, এইমাত্তর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসেছে ওরা, কেমন একটু রাগই হ'ল আমার। দৃষ্টির ঝাঁক এড়িয়ে আমি দেয়ালে ঝোলানো কালো বোর্ডটার দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। চকখড়ির লেখাগুলোসুদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, মনে হ'ল। মুহূর্তে বোর্ডটার লেখাগুলো আমার নানার মুখ হয়ে গেল। নানার চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, এমনকি শাদা দাড়িতেও হাসির ঝিলিক। নানার সেই হাসি পাখির

মতো সুরে বলছে, "কী ভায়া, মজা টের পাচ্ছ তো এখন!" কতগুলো দুষ্টু চঞ্চল চোখ, ঘরের দেয়াল, দেয়ালে ঝোলানো কালো বোর্ড, চকখড়ির লেখা—এই সবকিছুই যেন আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে একটা বিদঘুটে ফাঁদ পেতে বসেছে।

আস্তে-আস্তে ভয় গেল কেটে আর অচেনা হয়ে উঠল চেনা। কালো বোর্ডটার শাদা লেখাগুলো নানার দুষ্টমিভরা মুখ হয়ে ওঠে না আর। আবু তাহের, সূর্যকিশোর, আশরাফ, বিমল, সুবিমল, নীহার, শিশির, অনিল, নিরঞ্জন, সুজা—এরা সবাই বন্ধু হ'ল আমার। নামগুলো যেন মানিকের আলো দিয়ে গড়া। আজ ওরা শুধু কয়েকটা নাম। কিন্তু অনেকদিন আগে, যখন আমি পোগোজ ইশকুলের নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠতাম, নামতাম দিনে কয়েকবার, যখন রোদ্দুর-মাখা মাঠটায় গোল্লাছুট খেলতাম সবার সঙ্গে কিংবা বারান্দায় বসে পা দোলাতাম আপনমনে, শুনতাম হিন্দুস্থানি দারোয়ানের ঢং-ঢং-ঢং ঘণ্টাধ্বনি, তখন একদিন ওদের না দেখলে মন-খারাপ হয়ে যেত আমার।

তাহের ও আমি ঝগড়া করতাম প্রায়ই। কত কিল-ঘুসি-চড় বয়ে গেছে আমাদের ওপর! ঝগড়া হ'ত ঠিকই, কিন্তু গলাগলি করতেও দেরি হ'ত না আমাদের। দুটো শব্রিআম কিনলে একটা সে আমাকে দিত, অন্যটা খেত নিজে। একটা সন্দেশ কিনলে—হায়রে, দুটো সন্দেশ কেনার মতো পয়সা পেতাম না তখন—আধখানা তাহেরকে দিতাম আর নিজে খেতাম বাকি আধটা। মাঝে-মাঝে সূর্যকিশোরও ভাগ পেত। ব্লেড খাওয়ার অভ্যেস ছিল সূর্যকিশোরের। আস্ত ধারালো ব্লেড চিবিয়ে খেয়ে ফেলত সে। অবাক হয়ে দেখতাম। আমাকে অবাক হতে দেখে জাদুকরে মতো হাসত সূর্যকিশোর।

সূর্যকিশোর থাকত আরমানিটোলায়। আরমানিয়ানদের অনেক পুরোনো একটা গির্জে আছে সেখানে। আরমানিটোলায় কতদিন গেছি সূর্যকিশোরদের বাসায়। আজও সেই বাড়িটার ধার-ঘেঁষে পথ হাঁটি কখনো-সখনো। সেই জানালা এখনও আছে, আছে সেই পুরোনো দরজা। যদি কড়া নাড়ি, যদি নাম ধ'রে ডাকি, সূর্যকিশোর কি আগের মতো সাড়া দেবে আবার? ছুটে আসবে সে? ছুটে আসবে সেই ব্লেড-চিবিয়ে-খাওয়া ছেলেটা যার ঠোঁটে সবসময় লেগে থাকত এক টুকরো হাসি? আজ আর কড়া নেড়ে, নাম ধ'রে ডেকে লাভ নেই। সূর্যকিশোর সাড়া দেবে না। সে এখানে নেই, আরমানিটোলায় নেই। তাই সেই জানালার দিকে তাকিয়ে নিমগাছটার একরাশ পাতার ঝিলিমিলি দেখে নিরিবিলি হেঁটে যাই মাথা নিচু করে। মনে হয় পিছুপিছু কে যেন আসছে। সূর্যকিশোর নয়তো? কিংবা তাহের? না আমার মনেরই ভুল।

আরমানিটোলার মাঠ পেরিয়ে বাবুর বাজারের পুল পেরিয়ে ইসলামপুরের রকমারি দোকান ঘেঁষে কখনো পাটুয়াটুলির পথ মাড়িয়ে কখনো-বা

শাঁখারিবাজারের ভেতর দিয়ে পোগোজ ইশকুলে আসা-যাওয়া করতাম রোজ। শাঁখারিবাজারে ঢুকলেই একটা গন্ধ এসে জড়িয়ে ধরত আমাকে। শাঁখের গুঁড়োর গন্ধ। দেখতাম শাঁখারিরা শাঁখের ওপর করাত চালাচ্ছে দু'বেলা। সমস্ত গলিটা রূপকথার ভ্রমর হয়ে উঠত করাতের গুঞ্জনে। দিনের পর দিন ঐ সরু গলির ভেতর তৈরি হ'ত শাঁখের রকমারি সুন্দর সুন্দর সব জিনিস। ভাবতাম ছোট একটা গলিতে এত লোক থাকে কী করে, এত সুন্দর কাজই-বা শেখাল কে ওদের? সরু নরুনের মতো যন্তর দিয়ে শাঁখের গায়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা তো মজার খেলা। বছরের পর বছর ধরে এই ভারি মজার খেলাটা খেলে আসছে শাঁখারিরা। আজ যে-শাঁখারি শাঁখের কারুকাজময় চুড়ি বানাচ্ছে সে ওর বাবার কাছে শিখেছিল এই বিদ্যে। তার বাবা আবার শিখেছিল ওর বাবার কাছে। এমনিধারা হাতে-হাতে চলে এসেছে এই চমৎকার শাঁখের কাজ। আজ ঢাকা শহরের অনেক কিছু বদলে গেছে, কিন্তু শাঁখারিবাজার সেই আগে যেমন ছিল এখনও রয়ে গেছে ঠিক তেমনি। সেই সারি সারি পুরোনো বাড়ি, ছোট ছোট নিচু নিচু ঘর। সেই অন্ধকার। সেই শাঁখ, সেই করাত। সেই শাঁখের গুঁড়ো, সেই গন্ধ।

বাবুর বাজারের পুল পেরিয়ে ক'পা হাঁটলেই আমপট্টি। আমপট্টিতে ফলের দোকান। অনেক দূরের পেশোয়ারি ফল সাজানো থরেথরে। আর সাজানো রয়েছে নানা ধরনের আম। ফলের দোকানগুলোর উলটোদিকে ছিল আরেকটা দোকান। ফলের নয়। ছবি বাঁধানো হ'ত সেখানে। দোকানের ভেতর-বাইরে সবখানেই নানা রঙিন ছবির ভিড়। মুনি-ঋষি, মহাপুরুষ, লাল-নীল পরী সবাই আছে দোকান আলো করে। ইশকুল থেকে ফেরার পথে দাঁড়াতাম সেই দোকানের সামনে। কত্ত ছবি আর কী রঙের বাহার! যেন রঙের মেলা ব'সে গেছে।

একটা ছবি খুব টানত আমাকে। ভরাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম ঐ ছবির দিকে। আরও অনেক ছবি ছিল সত্যি, কিন্তু ওগুলো আমার চোখে লাগেনি। যে-ছবিটি মন কেড়েছিল ওটা ছিল একটা ঘোড়ার ছবি। ঘোড়ার গায়ে একঝাঁক তীর। ওর সমস্ত গা বেয়ে মোরগফুলের মতো লাল রক্ত ঝরছে। রক্তাক্ত ঘোড়াটাকে দেখে আমার মন হয়ে যেত ঝাঁঝাঁ। মনে হ'ত আমি অনেক দূরের একটা নিঝুম মাঠে চলে গেছি—সেখানে পাখির গান নেই, একরত্তি ঘাস নেই, খড়কুটো নেই, নেই এক ফোঁটা পানি। ইচ্ছে হ'ত ঐ তীর-বেঁধা কাচবন্দি ঘোড়াটাকে নিয়ে যাই বগলদাবা করে, তারপর টানিয়ে দিই আমার ঘরের দেয়ালে। কিন্তু ওটা কেনার মতো পয়সা পাব কোথায়? তবু একদিন সাহস ক'রে দোকানদারকে ঘোড়াটার দাম জিজ্ঞেস করলাম। দোকানদার জানিয়ে দিল যে, চার আনা পয়সা পেলে সে দুলদুলটা আমাকে দিয়ে দেবে। ওরে বাব্বাঃ, চার আনা! দাম শুনে আমি ভড়কে গেলাম—দুলদুলের পিঠ নিচের দিকে, পাগুলো ওপরে, দোকানদার আবছা।

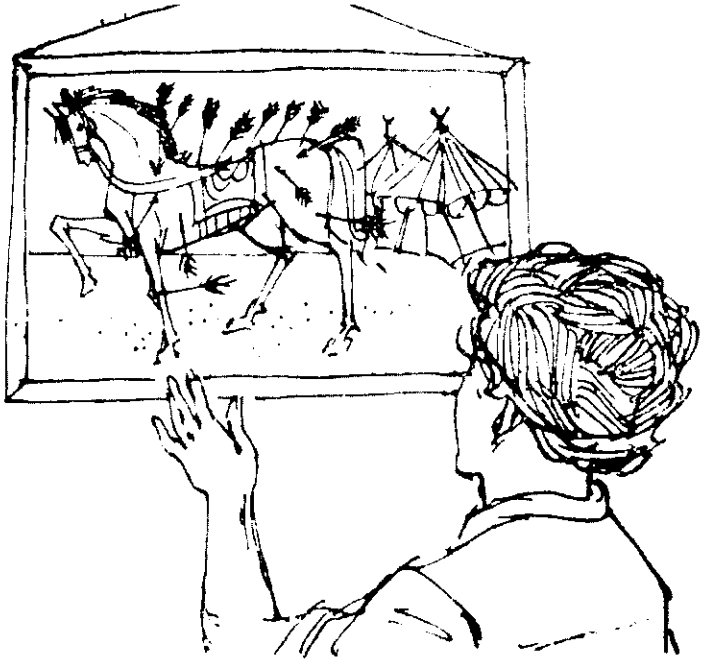

ঘোড়ার গায়ে এক ঝাঁক তীর

অন্ত পয়সা তো আমার নেই। মাত্তর একটা পয়সা আছে। আম্মা দিয়েছিলেন টিফিন খাওয়ার জন্যে। দুলদুলের দিকে, মানে ঐ তীর-খাওয়া ঘোড়াটার দিকে জুলজুল-চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করলাম।

ঠিক করলাম টিফিন না খেয়ে পয়সা জমিয়ে একদিন দুলদুলকে নিয়ে আসব আমার ঘরে। নানির মুখে কারবালার কথা শুনে-শুনে ইমাম হোসেনের সেই আশ্চর্য ঘোড়াটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তাই ওটা আমার চাই-ই। তবে একনাগাড়ে ষোলো দিন টিফিন না খেয়ে থাকতে হবে! কিছুই দমাতে পারল না আমাকে—শব্রিআম, সন্দেশ ইত্যাদির লোভ সামলে তিন দিনে তিনটে পয়সা জমালাম। কিন্তু চতুর্থ দিনে ইশকুলের গেটের সামনে ঝাঁকাভরতি সবুজ সবুজ, হলুদ শব্রিআম দেখে মন গেল টলে। জিভের ডগায় পানি, ঢোক গিলে পকেট থেকে বের করলাম পয়সা। হাতে এল ডাঁশা-ডাঁশা খাসা শব্রিআম। থামলাম না মুহূর্তের জন্যে, দাঁত বসিয়ে দিলাম শব্রিআমের চকচকে শরীরে। এমনি ক'রে

শব্রিআম কেনা আর না-কেনার ফাঁক দিয়ে সোনার পানির মতো গড়িয়ে গেল অনেকগুলো দিন। চার আনা পয়সাও হয় না আর দুলদুলকেও আনা হয় না বাড়িতে। কিন্তু ইশকুল থেকে ফেরার পথে রোজই ওর সঙ্গে দেখা করে আসি। দোকানের সেই কাচবন্দি ঘোড়াটা আমার স্বপ্নের তেপান্তর মাঠে রেশমের ঝালরের মতো কেশর দুলিয়ে রঙিন চাদর ঝুলিয়ে দৌড়ে বেড়াত মাঝে-মাঝে। তখন ঐ নিঠুর কালো কালো তীরগুলো বদলে যেত শাদা নরম পালকে।

অনেক কষ্টের পর একদিন আমার খাজাঞ্চিখানায় জমে উঠল ষোলো-ষোলোটা পয়সা। হাতের মুঠোয় পয়সাগুলো নিয়ে হাজির হলাম সেই দোকানে। দোকানদারের হাতে পয়সা গুঁজে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল ছেয়ে নেমে এল তীরবেঁধা, রক্তাক্ত দুলদুল। দুলদুলকে নিয়ে চোঁচা চম্পট। একদৌড়ে পৌঁছে গেলাম বাড়ি। দেয়ালে ছোট্ট একটা পেরেক গেঁথে দুলদুলকে টানিয়ে দিলাম সেখানে। প্রথম ক'দিন দিব্যি মেতে রইলাম দুলদুলকে নিয়ে—একে দেখাই, ওকে দেখাই আর দিনরাত শুধু দুলদুলের গল্প করি সবার কাছে। কিন্তু আস্তে-আস্তে একদিন আমার উৎসাহ ধিমে হয়ে এল। দুলদুল দেয়ালেই রইল, অথচ ঘনঘন আর চোখ পড়ে না ওর ওপর। একদিন দেখি কি, এরই মধ্যে ধুলোর সর জমে উঠেছে দুলদুলের গায়ে। তাড়াতাড়ি ধুলো পরিষ্কার করতে লেগে গেলাম। বুঝি তাড়াহুড়োর জন্যেই হঠাৎ তীরবেঁধা রক্তাক্ত ঘোড়াটা আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ল লুটিয়ে। কাচ ভেঙে চুরমার।

দুলদুলের এই হালের জন্যে মনে যতটা কষ্ট পাব ভেবেছিলাম ততটা কষ্ট হয়নি আমার! এজন্যে নিজের ওপরই রাগ হ'ল খুব। যেখানে কাচবন্দি দুলদুলকে টানিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে বিচ্ছিরি একটা শূন্যতা ঝুলে রইল। মনে হ'ল, ড্রইং খাতায় একটা ছবি এঁকেছিলাম অনেক কষ্ট করে, কিন্তু এইমাত্তর মুছে ফেলেছি রবার দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে।

পাঁচ

"এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।" যেন কোনো জাদুকরের মুখের বুলি। শুনলেই চোখে কুয়াশা জমে, কানে শিশিরের বোল বাজে মিহি সুরে, ফুরফুরে সুরে—টুপ্ টাপ্, টুপ্ টাপ্! ইচ্ছে হয় চুপচাপ ব'সে থাকি অনেকক্ষণ এক জায়গায়, একটুও না ন'ড়েচ'ড়ে। ব'সে থেকে সেই জাদুকরের মুখের বুলি আওড়াতে ভারি ইচ্ছে করে মানিকের রঙের রাঙা কোনো কবিতার লাইনের মতো। অন্য সব খেলা ছেড়ে এই "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা" শব্দের খেলায় ডুবে থাকতাম কতদিন। মহর্‌রমের সময় যখন দেখতাম, কিছ

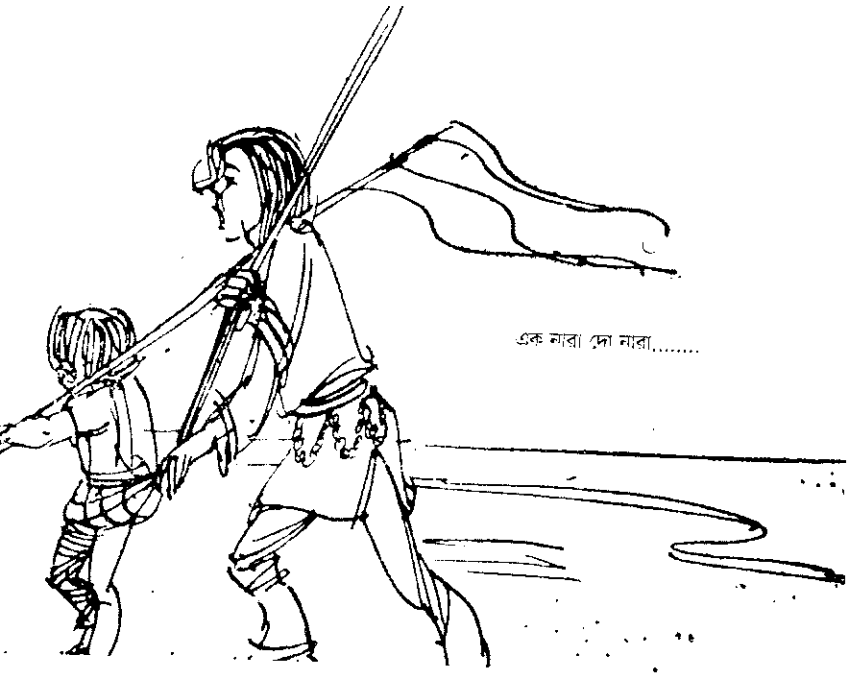

ছেলেপেলে শাদা পাজামার ওপর টিয়েপাখির ডানার রঙের মতো সবুজ লুঙ্গি আর সবুজ কুর্তা প'রে, কবজিতে ঝলমলে তারের কাঁকন বেঁধে হাতে নিশান নিয়ে ভেস্তা সেজে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন কী-যে ভালো লাগত আমার! শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও ভেস্তা সাজে মহররমের সময়। মিছিলে-মিছিলে ভেস্তারা আওয়াজ তোলে "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।"

মহররমের কথা উঠলেই মনে পড়ে, ইমাম হোসেন ফোরাত নদীর তীরে কারবালার ধূ-ধূ মাঠে প্রাণ হারিয়েছিলেন শত্তুরের হাতে। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই প্রাণ হারিয়েছিলেন কারবালায়। সখিনার হাতের মেহেদির রং আর কাসেমের রক্তের রং এক হয়ে গিয়েছিল সেদিন। ফোরাত নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছিলেন তাঁরা, কিন্তু তেষ্টা মেটানোর জন্যে এক ফোঁটা পানিও পাননি কেউ। বুক-ভরা তেষ্টা নিয়ে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিলেন অনেকে। কেউ-কেউ বন্দি হলেন শেষে। এসব কথা 'বিষাদ সিন্ধু' বইয়ে প্রথম পড়ি। মীর মোশাররফ হোসেনের লেখা বই।

মনে পড়ে, একবার সেই মস্ত বইটা আগাগোড়া পড়ে শোনাই আমার নানিকে! নানিও বইয়ের সব জায়গা ভালো বুঝতে পারতেন না। আমাকে সহজ করে বুঝিয়ে বলতে হ'ত জায়গায় জায়গায়, থেমে থেমে। আমিও বুঝতে পারতাম না কিছু অংশ। সবগুলো শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। কোনো আস্ত লাইন কেমন গোলমেলে ধোঁয়াটে ঠেকত সেজন্যে। অনেকগুলো শব্দ আবার ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতেও কষ্ট হ'ত পষ্ট। তবুও হোঁচট খাব না, নানির কাছে কিছুতেই নাকাল হব না, এমন একটা পণ করেছিলাম মনে-মনে। মুখে যা আসত তা-ই গড়গড় করে পড়ে যেতাম—নানি তো আর বুঝতে পারবেন না আমার কেরদানি! নানিকে সহজ করে বুঝিয়ে বলার সময় মীর মোশাররফ হোসেনের কাহিনীতে যে আমারও কিছু কথা মিশে যেত না, এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম, এতক্ষণ ধরে আমার বকবকানি নানি শোনেন কী করে? খারাপ লাগে না তাঁর? হয়তো ধর্মের কাহিনী শুনছেন বলেই আমার বিষাদসিন্ধু পড়া তাঁর ভালো লাগত। আমার পড়ার ভঙ্গি তিনি অপছন্দ করতেন বলেও মনে হয় না। কারণ আমার পড়ার তারিফ শুনেছি নানির মুখে।

যাহোক, মহর্‌রমের সময় হোসেনি দালানে যেতাম আমরা সব ছেলেমেয়ের দল। আমাদের সঙ্গে থাকতেন একজন মুরুব্বি। চান খাঁর পুল অর্থাৎ নাজিমুদ্দীন রোডের কাছাকাছি জায়গাতেই হোসেনি দালান। একটা পুকুরের উত্তর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অনেকদিনের পুরোনো দালান। ইমামবারা। এমনিতে হোসেনি দালান সুনসানই থাকে, কিন্তু মহর্‌রমের লোক-গিজগিজ করে সেখানে। রাতদিন

আমার বকবকানি নানী শোনেন কি করে

লেগে থাকে লোকজনের অনাগোনা। রীতিমতো বড় মেলা বসে যায় হোসেনি দালানে। কত্ত খেলনা, রংবেরঙের পুতুল, টিনের বাঁশি, মাটির নৌকো, কাঠের ঘোড়া, আরও কত কী! সন্ধ্যাবেলায় দামাল সূর্য তার খেলা শেষ ক'রে যখন উধাও হয় অন্ধকারের রাজ্যে, তখন অনেক অনেক মোমবাতি জ্ব'লে ওঠে। আলোর অলংকার প'রে রাতে হোসেনি দালানের রূপ যায় খুলে। দুঃখের কথা মনেই হয় না আর। খেলনার ঝকমকি, দালানের রাঙা আলো দেখে মন খুশিতে নেচে ওঠে দোকানে সাজিয়ে রাখা স্প্রিং-দেয়া রঙিন পুতুলের মতো। ক্লাসে মাস্টারমশায়ের বকুনি খেয়েছিলাম, পেন্সিলের শিস ভেঙে দিয়েছিল সূর্যকিশোর, হঠাৎ ঘুসি মেরেছিল আবু তাহের, অরুণের হাতের লেখার মতো সুন্দর নয় আমার হাতের লেখা—তখন এইসব দুঃখ মন থেকে মুছে যেত একেবারে।

হোসেনি দালানের পুকুরটার সামনে দাঁড়ালে কেমন গা-ছমছম করত। পুকুরের পানি দেখতে ভালো ছিল না তেমন। কেমন মরা, সবুজ-সবুজ। ছ্যাঁতলা-পড়া। মনে হ'ত, পানি থেকে আজগুবি একটা জানোয়ার ঝপ ক'রে উঠে এসে খপ ক'রে ধ'রে ফেলবে আমাকে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠত, ভীষণ তেষ্টা পেত তখন। ভয়ের কারণও ছিল। পুকুরটার একটা বদনাম আছে। প্রতি বছর হোসেনি দালানের পুকুর 'ভোগ' নেয় বলে আগেই শুনেছিলম। কেউ-না-কেউ প্রতি বছর

ডুবে মরত ঐ পুকুরে। শুনেছি, রাতদুপুরে ইয়া বড় বড় 'ডেগ' অর্থাৎ তামার মস্ত হাঁড়ি ভেসে ওঠে হোসেনি দালানের পুকুরের মরা সবুজ-সবুজ পানির ওপর। কাহন কাহন সোনা আর মুক্তো-মানিক নাকি ভরা সেসব ডেগের ভেতর। কে কবে সেই ডেগগুলো দেখেছে কিংবা দেখলেও কেন ডেগ থেকে কাহন কাহন সোনার এক দানা সোনাও তুলে নেয়নি, এসব কথা কেউ জানতে চাইলে তার ঠিক জবাব পাওয়া মুশকিল। এ-ব্যাপারে সবার মুখেই যেন খিল। কেউ বলে, অমুকের নানা দেখেছে, কেউবা বলে তার দাদার দাদা দেখেছে। আর সোনার কথা যদি বল, গায়েবি মালে হাত লাগাবে এমন সাধ্যি কার? নির্বংশ হয়ে যাবে না সে? সাত পুরুষের ভিটে খাঁখাঁ করবে, সোনার চাঁদ ছেলের বদলে ঘুঘু বেড়াবে সেখানে।

নানা গল্পের জন্যেই হোক, কিংবা এমনি কোনো কারণেই হোক, আমি কিন্তু সত্যি ভয় পেতাম পুকুরটাকে। মরা সবুজ-সবুজ পানি সত্ত্বেও ওকে কেমন জ্যান্ত মনে হ'ত। তাই বেশিক্ষণ দাঁড়াতাম না সেই পুকুরের ধারে। চলে যেতাম দালানের ভেতর। কে তৈরি করেছিলেন এই হোসেনি দালান? কেউ বলেন নবাব নসরৎ জঙ্গ, আবার কেউবা বলেন, মীর মুরাদ। শোনা যায়, মুরাদ স্বপ্নে ইমাম হোসেনকে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, ইমাম হোসেন একটা তাজিয়াখানা বানাচ্ছেন। তাজিয়াখানা মানে শোকের বাড়ি। এই স্বপ্ন ভাবিয়ে তুলল মীর মুরাদকে। তারপর মীর মুরাদ একদিন ঠিক করলেন যে একটা দালান বানাবেন। দেখতে-দেখতে গড়ে উঠল দালান, শোকের বাড়ি। মীর মুরাদ বাড়িটার নাম রাখলেন হোসেনি দালান। মহর্‌রমের প্রতি বছর হোসেনি দালানকে আলো দিয়ে সাজানো ও গরিবদের খাওয়ানোর জন্যে যে-টাকাপয়সা খরচ হ'ত তা' মীর মুরাদই দিতেন।

দালানের ভেতরটা বেশ রহস্যময় মনে হ'ত। যেন মায়াপুরীর এমন একটা অংশ, যেখানে সবকিছুই কেমন আঁধার-জড়ানো, দীর্ঘশ্বাস-ছড়ানো। দালানের নিচে কয়েকটা কুঠুরি। ওগুলোতে কবর রয়েছে কয়েকটা। হোসেনি দালানের বাইরে আলোর ঝিলিক, ঝলমলে মেলার গুঞ্জন, কিন্তু ভেতরে হুহু মাতম। কে যেন গুমরে কাঁদছে। দালানের দেয়াল ফুঁড়ে প্রতিটি ইটের ফাঁক থেকে হুহু বেরিয়ে আসছে গুমরে-ওঠা কান্না। সেই কান্না আর মর্শিয়ায় সুর এক হয়ে আমার বুকে বইয়ে দিত ঠাণ্ডা, ভেজা হাওয়া। কোনোকিছুরই মানে খুঁজে পেতাম না, কিন্তু বড্ড কান্না পেত। কেন জানি মনে হ'ত, পাষাণপুরীর সেই ঘুম-যাওয়া রাজকন্যা কোনোদিনই জাগবে না। শিয়রে বারবার সোনার কাঠি ছোঁওয়ালেও সে জাগবে না আর। চিরকালের জন্যে সেই রাজকন্যা ঘুমের দেশে চলে গেছে। যারা ঐ নিচের ছায়া-ছায়া, ঠাণ্ডা কুঠুরিতে ঘুমিয়ে রয়েছে ওরাও তো কোনোদিন চোখ

খুলবে না। যারা কুঠুরিতে কবরতলায় ঘুমিয়ে আছে, ওদের আমি কখনো দেখিনি। ওদের চিনি না আমি। তবু কেন আমার বুকে ঠাণ্ডা, ভেজা হাহাকার? তবু কেন আমার কান্না পায় অমন ক'রে? হোসেনি দালানের দেয়ালগুলোতে কী এমন আছে যা একটা ছোট ছেলেকেও কাতর ক'রে ফেলে এভাবে?

কিন্তু কী মজা, ছায়া-ছায়া মাতম-মাখা দালানের বাইরে এলেই ঠাণ্ডা ভেজা হাওয়া নেই বুকের কুঠুরিতে, আর নেই কান্না-পাওয়া। আছে ঝলমলে আলো, মোমবাতির টলটলে আলো। আলো গ'লে পড়ছে সবখানে। মানিক-রং আলো আছে হোসেনি দালানের গায়ে। আর আছে মেলা। মেলায় ভিড়। লোকজন। ছেলেমেয়ে। আমরা। আরও অনেকে আমাদের মতো। সবার মুখে খুশির ঝলক। চোখের পলক পড়তে চায় না খেলনার বাহার দেখে। আহা রে, আরও যদি কিছু পয়সা থাকত তা হলে ঐ পাগড়ি-পরা রাজাটাকে কেনা যেত। হাতের মুঠোয় পাওয়া যেত রূপকথার রাজাকে। ভারি মজা হ'ত, তাই না? না, টিনের কুলো কিনে দিলে হবে না, পাগড়ি-পরা রাজা ছাড়া আব কিছু চাই না।

আর মেলা বসত কারবালায়, মানে শহর থেকে দূরে, আজিমপুরে। সেখানেও লোকজনের ভিড়। মানুষ—ছোট, বড়, মাঝারি। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে সবাই। মেয়েরা মিছিল দেখত, ভিড় দেখত, তাজিয়া দেখত, ঘোড়ার গাড়ির বন্ধ খিড়কির ফাঁক দিয়ে। ঘোড়ার গাড়ির বাইরে ওদের আসতে মানা। এখানেও রকমারি খেলনা আর খাবার জিনিস। নিমকি, মুরখি, মুড়কি, গোলাবি লেউড়ি, নাড়ু, আরও কত কী! চড়া রোদে দুপুরে কারবালা তেতে উঠত ভয়ানক, যেন রুটি-সেঁকার গরম তাওয়া। একটু হাওয়া, একটু ছায়ার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ত। খেলনা আর রবেরঙের জিনিস দেখে আমরা যারা ছোট তারা রোদের সুচের খোঁচা খেয়েও ভুলে থাকতাম। তবে মাঝে-মাঝে তেষ্টায় বুক ফেটে যেত। রক্ষে, ভেস্তারা মাটির খুরিতে পানি দিত খেতে। কারবালায় মেলা বসত আশুরা অর্থাৎ মঞ্জিলের দিন। মহর্‌রমের দশম দিনকেই বলে আশুরা। কারবালার একটা দৃশ্য কিছুতেই ভুলতে পারি না আজও। মিছিলে কিছু লোক বুক চাপড়াচ্ছেই, অনেকে আবার ছুরি দিয়ে বুক ঠুকছে—টাটকা রক্ত বেরুচ্ছে ওদের বুক থেকে। দরদরে ঘাম আর রক্ত একাকার। এটা আমার ভালো লাগত না কিছুতেই। ও-কাজে সায় ছিল না আমার। কিন্তু আমি চাইলে না-চাইলে কী এসে যায়, যাদের কাজ তারা করবেই।

আর ভুলতে পারি না তাজিয়া ডোবানোর সেই দৃশ্য। মিছিলের লোকজন "ইয়া হোসেন, ইয়া হোসেন" বলছে না "হায় হোসেন, হায় হোসেন" বলছে তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না। মনে হ'ত, ওরা "হায় হোসেন, হায় হোসেন"ই বলছে।

ইমাম হাসান হোসেনের নকল কবরকেই বলে তাজিয়া। কাগজ দিয়ে তৈরি। আমার কিন্তু ওগুলোকে আসল কবর ব'লেই মনে হ'ত তখন। তাই পানিতে তাজিয়া ডুবতে দেখে মন-খারাপ হয়ে যেত আমার। হোসেনি দালানের সেই দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা কান্নার হুহু সুর বেজে উঠত কারবালায়। আকাশে তখন সূর্য শুধু যাই-যাই করছে।

মহররমের মিছিল.....

মহররমের মিছিল সবচেয়ে ভালো লাগত চকে। মাঝরাতের মিছিল। নানির সঙ্গে যেতাম চকবাজারের একটা বাড়িতে রাত্তিরে মিছিল দেখব ব'লে। নানি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন আর আমি মিছিলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ঝিমুতাম। কখন ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি তাদের রুপালি সোনালি পাখা দুলিয়ে সবচেয়ে মিষ্টি এক সুরে গান গাইতে গাইতে হাজির হতেন চকের

সেই বাড়িটার আঁধার-ভরা বারান্দায়, টের পেতাম না। ঘুম ভাঙত নানির ঝাঁকুনিতে "কীরে মিছিল দেখবি না?" চোখ কচলাতে কচলাতে বলতাম, "কই মিছিল?" নানিব জবাবের জন্যে অপেক্ষা করতে হ'ত না। ততক্ষণে মিছিলের শব্দ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েছে আমার কানের ভেতর। একটু পরেই চোখের সামনে ঝলমলে মিছিল। আলম বরদার, আশা বরদার, কালো কাপড়ে ঢাকা বিবিকা ডোলা,—একে একে সবকিছু চোখের সামনে। আমার চোখ লুট করতে শুরু করে সিল্কের নিশান, লাঠির ঠোকাঠুকি, তলোয়ারের ঝলসানি, আগুনের চরকি। ফাঁকে-ফাঁকে শোনা যায় ভেস্তাদের "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।'

চোখ জুড়িয়ে যেত লাঠি ঘোরানোর কায়দা দেখে, আগুনের চরকির খেলা দেখে। মনে হ'ত, যদি আমিও ফুরফুরে বাতাসে দুলে-ওঠা ঐ সুন্দর সিল্কের রঙিন নিশান নিয়ে ভেস্তাদের সঙ্গে মিছিলে যোগ দিতে পারতাম! লোভে নতুন পয়সার মতো চকচকিয়ে উঠত আমার চোখ দুটো। ঐ তো চলেছে কাগজের কবর। আর চলেছে দুলদুল ঘোড়া। দেখি, ওর তীর-বেঁধা গায়ে একটা চাদর, চাদরে নকল রক্তের ছোপ। আর দেখি সিল্কের রঙিন নিশানের ঝাঁক। ঝিলমিল, ঝিলমিল। নীল, লাল, সবুজ, হলদে—হরেকরকম। দেখি ভেস্তার দল। পরনে টিয়ের ডানার রঙের মতো সবুজ লুঙ্গি, সবুজ কুর্তা। খালি পা। হাতে রূপালি তারের কাঁকনের মতো কী যেন একটা। দূর থেকে মনে হয়, তারা জ্বলছে ওদের কবজিতে। আর শুনি ভেস্তার দল বলছে ঃ "এক নারা, দো নারা, বোলো বোলো ভে—স্তা।"

ছয়

বেড়ালের মতো পা ফেলে আসত সন্ধেগুলো। ফুলো ফুলো তুলোর মতো নরম পা, তাই শব্দ হ'ত না একটুকুও। কে যেন মস্ত চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলত চারদিকের সোনালি জলের মতো রোদ্দুর। রোদ্দুর হারিয়ে গেলেই অন্ধকার। পথঘাট আবছা। বাড়িগুলোর গা-জুড়ে কালির পোঁচ। অলিগলি কালো, রাস্তা কালো, আরমানিটোলার গির্জে কালো, সদরঘাটের কামান কালো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো আহসান মঞ্জিলের গম্বুজ কালো। একটু পরেই ফুটকির মতো আলো ফুটে উঠে নানান জায়গায়। ঘরে আলো, দোকানপাটে আলো, রাস্তাঘাটে আলো, মসজিদে আলো, মন্দিরে আলো, গির্জায় আলো। বস্তিতে আলো, আহসান মঞ্জিলে আলো। আদম শফি ওস্তাগারের খোলার ঘরে আলো, লাটসাহেবের ইমারতে আলো,—এমনি অনেক জায়গায় আলোর ঝিকিমিকি। কোথাও হাবিকেন, কুপি, কোথাওবা বিজলিবাতি।

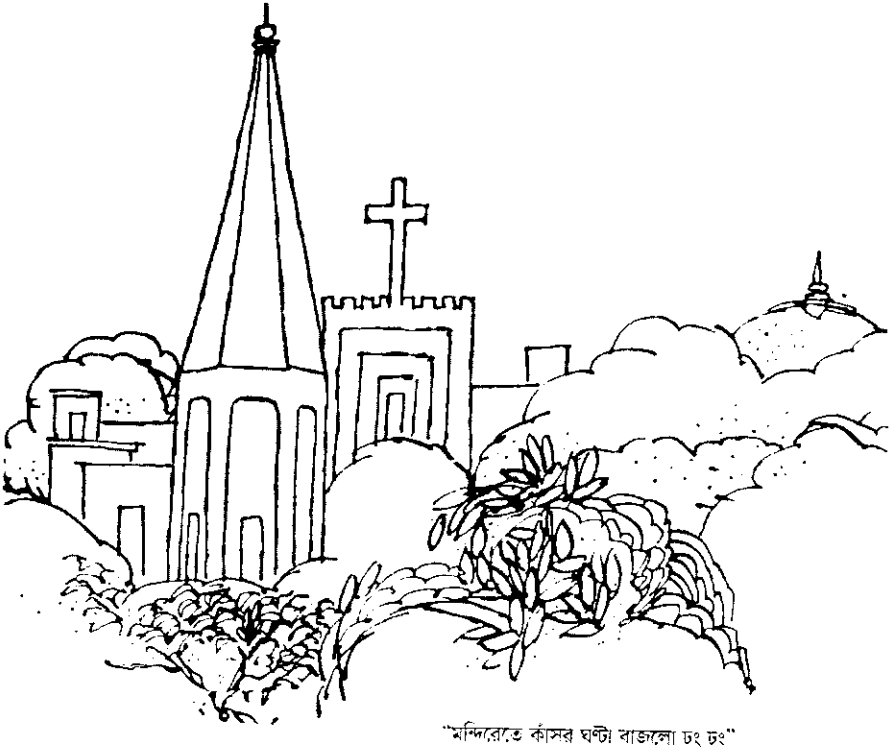

"মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং"

সন্ধে হ'লেই রোজ একটা শব্দ ভেসে আসত—কখনো দূর থেকে, কখনো-বা অনেক কাছ থেকে। ঘণ্টার শব্দ। ঢং ঢং ঢং। বেজে চলত একটানা। মনে হ'ত এই সন্ধ্যা-দোলানো আওয়াজ থামবে না কোনোদিন। সেই ঘণ্টার শব্দ কান পেতে শুনতাম অনেকক্ষণ। টেবিলের ওপর বই প'ড়ে থাকত খোলা। রবার্ট ব্রুস মাকড়সার জালের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছেন—সেদিকে আমার খেয়াল নেই মোটেই। আমার মন-কান সবই তখন সেই ঘণ্টার শব্দের দিকে উধাও। বড় ভালো লাগত সেই ঘণ্টার শব্দ শুনতে। ঘণ্টার শব্দ শুনে মনে হ'ত, এইমাত্র রানির কোল আলো ক'রে জন্মেছে ডালিমকুমার। তাই বেজে চলেছে ঘণ্টা, খুশি রটাচ্ছে চারদিকে। আসলে কিন্তু কোনো রাজবাড়ি থেকে সেই ঘণ্টার শব্দ আসত না, আসত মন্দির থেকে। যেদিন প্রথম পড়েছিলাম, "মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং," সেদিন নতুন ক'রে ঘণ্টার শব্দের স্বাদ পেয়েছিলাম আমি; সারাদিন মনটা দুলে দুলে উঠেছিল খুশির দোলায়। সত্যি বলতে কি, সবসময় ঘণ্টার আওয়াজ

শুনে মন নেচে উঠত না আমার; কখনো-কখনো মন-খারাপ হয়ে যেত। কেমন উদাস লাগত সন্ধেবেলাকে, যেন সে ঘুঁটেকুড়ানি দুয়োরানি। মনের দুঃখে ব'সে কাঁদছে বিজন বনে। আর সেই দুয়োরানির সন্ধেবেলার দুঃখের বোঝা কেউ যেন আমার মনের উঠোনে জড়ো করত। ইচ্ছে হ'ত, তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে তেপান্তরের মাঠে, জনমনিষ্যি-নেই বনে। কিন্তু যাব কী করে? আমার যে পক্ষিরাজ ঘোড়া নেই। ডানাঅলা ঘোড়া তো দূরের কথা, এমনি সাদাসিধে ঘোড়াও নেই একটা। আমাদের মহল্লায় যে আস্তবলটা আছে, সেখানে অবশ্য তিন-চারটে ঘোড়া আছে। ওরা ভারি রোগা, ওদের পিঠে দগদগে ঘা। রাগী কোচোয়ানের গড়গড়ে রাগের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে ওরা, তিন-চারটে ভালোমানুষ-ঘোড়া। দেখলেই, কেমন মায়া হ'ত। চাবুক খেয়ে-খেয়ে বেচারিদের দম বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। গাড়োয়ান একটু আধটু মলমও তো লাগাতে পারে গোড়াগুলোর ঘায়ে। রাজ্যের মাছি উড়ে এসে জুড়ে বসে ঘায়ের ওপর। ঘোড়া গলা ঝাঁকায়, পা নাচায়, লেজ নাড়ায়, তারপর আবাব ঝিমোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গাড়োয়ানের কাছে চাইলে সে তো আর একটা ঘোড়া আমাকে দিয়ে দেবে না, তা ছাড়া এমন রোগা ঘোড়া নিয়ে কি তেপান্তরের মাঠে পৌঁছনো যায় কোনোদিন?

তাই আর যাওয়া হয় না কোথাও। যাওয়া যখন হ'লই না তখন খুব ক'ষে পড়ো রবার্ট ব্রুস আর মাকড়সার গল্প আর দুলে দুলে মুখস্থ করো—

"বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,
মাগো আমার শোলোক বলা কাজলা দিদি কৈ?"

কাজলা দিদিকে কখনো দেখিনি। কাজলা দিদি আমার কেউ নয়। তবু সেই কখনো-নাদেখা দিদিটির কথা ভেবে মন হুহু ক'রে উঠত। মনে হ'ত, কাজলা দিদি কোন অজানায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কালো বৃষ্টিতে ভিজছেন তো ভিজছেনই। চিরকাল বর্ষায় ভিজবেন তিনি। কেউ তাঁকে ঘরে ডেকে আনবে না। অথচ কত সুন্দর সুন্দর শোলোক বলতে পারতেন কাজলা দিদি! তাঁর কাছ থেকে কখনো কোনো শোলোক শুনতে পাইনি ব'লে আফসোস হ'ত আমার, খুব কষ্ট পেতাম মনে-মনে। ভাবতাম, যদি হঠাৎ একদিন, যখন চাঁদির গোল থালার মতো চাঁদ উঠবে, যখন হাওয়ার ঝাঁকানিতে গাছের পাতাগুলো শিরশিরিয়ে উঠবে, গলির মোড়ে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো ঝিমোবে, কাজলা দিদি এসে দাঁড়ান আমার বিছানার পাশে, তখন কেমন মজা হবে? সারারাত জেগে-জেগে আশ্চর্য সব শোলোক শুনব কাজলা দিদির মুখে।

কিন্তু কাজলা দিদি আসেননি কোনোদিন। আসেননি আমার পড়ার ঘরে, বিছানার পাশে, টেবিলের কাছে, বারান্দায়, ছাদে, গলির মোড়ে, ইশকুলের মাঠে,—আসেননি কোথাও। বাঁশবাগানে গেলে কি দেখা পেতাম তাঁর?

বাঁশবাগানেও গিয়েছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আসেননি কাজলা দিদি। সাঁঝে কাজলা দিদি আসেন না, আসে ঘণ্টার শব্দ। মন্দির থেকে ভেসে-আসা কাঁসরঘণ্টার আওয়াজ। কোনো মন্দিরে যাইনি ছেলেবেলায়, তবে রমনার কালীবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করেছি অনেক দিন। খেলতে যেতাম রমনার ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমরা তিন-চার জন বালক। কখনো টারজন-টারজন খেলতাম, কখনো চোর-পুলিশ আর কখনো গোল্লাছুট। ফুটবল খেলাও চলত কখনো-সখনো। রমনা কালীবাড়ির খুব পুরোনো একটা নাম আছে। কৃপাসিদ্ধি

জন্মাষ্টমীর মিছিল

আখড়া। শোনা যায় প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে গোপালগিরি নামে একজন লোক এসেছিলেন বদ্রিনারায়ণ থেকে, তিনিই এই আখড়ার পত্তন করেছিলেন। এখন যে-মন্দিরটা রয়েছে সেটি তৈরি করেন হবুচরণ গিরি, প্রায় আড়াইশো বছর আগে। রমনার কালীবাড়ির আশেপাশে ঘুরতাম, দৌড়ে বেড়াতাম, কিন্তু কখনো মন্দিরের ভেতরে পা রাখিনি। কেমন ভয় হ'ত, রীতিমতো গা-ছমছম করত আমার। দু'একজন মরুব্বি মন্দির সম্পর্কে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার মনে। সেই ভয় অনেকদিন পর্যন্ত কাটেনি।

ছেলেবেলায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরেও যাইনি, শুধু দূর থেকে দেখেছি। কেউ-কেউ বলেন, ঢাকেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই ঢাকা নামের জন্ম। ঢাকেশ্বরী মন্দির রাজা মানসিংহ বানিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কারও কারও মতে, আসল মন্দিরটি রাজা মানসিংহ বানাননি, তিনি নতুন করে বানিয়েছিলেন পুরোনো এক মন্দিরকে। ঢাকেশ্বরী মন্দির ঠিক কখন তৈরি হয়েছিল তা কারুর জানা নেই। তবে মন্দিরের ধরন-ধারণ দেখে এটি সতেরো শতকের তৈরি ব'লে আন্দাজ করা হয়।

ছেলেবেলায় কখনো মন্দিরের ভেতরে যাইনি সত্যি, কিন্তু পূজো দেখেছি। আর দেখেছি জন্মাষ্টমীর মিছিল। আর সে কী মিছিল! রাস্তা-উপচে-পড়া লোকজন। দোকান, বাড়িঘর, রাস্তা—সবখানেই হৈহৈ লোক,—বারান্দায়, ছাদে, সবখানে। লোক, লোক আর লোক—ছেলে-বুড়ো সব্বাই মিছিল দেখতে চায়। তাঁতি বাজারে ধুম, শাঁখারিবাজারে ধুম, নবাবপুরে, ইসলামপুরে, গেন্ডারিয়ায়, গোয়ালপাড়ায়, ওয়ারিতে—সব জায়গাতেই মহাধুম। শ্রীকৃষ্ণ, সেই যিনি বাঁশি বাজিয়ে মুগ্ধ করতেন সবাইকে—তাঁর জন্ম উপলক্ষেই বেরুত জন্মাষ্টমীর মিছিল। মস্ত হাতি, ইয়া বড় বড় রথ। রথে দেবদেবীর মূর্তি। বানানো জন্তু-জানোয়ারেরও কমতি নেই। কোথাও রাক্ষস-খোক্ষস, কোথাও ডানাঅলা পরী। সুন্দর, বিরাট সব পুতুল। দেখে চোখ জুড়োয়। নানা মূর্তিকে দিয়ে বলানো হচ্ছে নানা গল্প-কাহিনী। রং মেখে, সং সেজে অনেকে লোক হাসাচ্ছে। অনেক বিখ্যাত লোকের পার্ট করছে নানাজন নানাধবনের পোশাক প'রে, দাড়িগোঁফ লাগিয়ে। অতশত বুঝতাম না তখন, কিন্তু চোখ ভ'রে দেখতাম রঙিন পরী আর রকমারি জন্তু-জানোয়ারগুলোকে। আর বড় লোভ হ'ত কৃষ্ণের বাঁশিটার ওপর। কত কৃষ্ণ কত বাঁশি—অথচ একটিও পাওয়ার জো নেই।

একদিন বিকেলবেলায় একটা খাতায় জলছবি তুলছিলাম। মাত্র কয়েকটা ছবি তোলা হয়েছে, এমন সময় ডাক পড়ল আমার বাইরে থেকে। বেরিয়ে দেখি, সূর্যকিশোর হাসছে মিটিমিটি। ওর হাসি দেখে সবগুলো জলছবি তুলতে না পারার বিরক্তিটা ঝ'রে গেল মন থেকে। রীতিমতো খুশি হয়ে উঠলাম।

"কীরে যাবি না?"—সূর্যকিশোর জিজ্ঞেস করল।

"কোথায়?"—পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

"ইশকুলে।"

"কেন?"

"চল, সরস্বতী পূজো দেখবি চল।"

"ভয় করে"—আমি বললাম আমতা-আমতা ক'রে।

"ভয় কিসের? সরস্বতী ডাইনি নাকি যে তোকে গপ ক'রে গিলে ফেলবে?"—সূর্যকিশোরের চোখেমুখে দুষ্টুমিভরা হাসির ঝিকিমিকি।

"না, আমি যাব না। তুই যা।"

"তোকে যেতেই হবে। চল, খুব মজা হবে।"—সূর্যকিশোর আমাকে লোভী ক'রে তোলে। তাই যেতেই হ'ল।

ইশকুলে উৎসব। অনেক ছেলের জটলা। মাস্টারমশাইরা সবাই এসেছেন। আসেননি শুধু মৌলবি সাহেব, যিনি আরবি ফারসি পড়ান ওপরের ক্লাসে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। সূর্যকিশোর আমার পাশেই থাকল সারাক্ষণ। সরস্বতীকে দেখে ভয় পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু বেশ ভালোই লাগল সরস্বতী দেবীকে।

খুব শান্ত আর সুন্দরী। রাঙা পায়ের নিচে পদ্ম আর শাদা একটা হাঁস। হাতে বীণা।

"ইনি-ই আমাদের সব্বাইকে বিদ্যা দেন"—সূর্যকিশোর বলল আমার কানে-কানে। ওর কথায় কান না দিয়ে আমি দেখছিলাম সরস্বতীর শাদা হাঁসটাকে। দুধ-শাদা ধবধবে ডানা আর লাল টুকটুকে ঠোঁট। সরস্বতীর হাঁস দেখে মনে পড়ল আমার নিজের হাঁসের কথা। আমার আর আমার ছোট ভাই দুজনেরই দুটো হাঁস ছিল। আম্মা বাজার থেকে আনিয়েছিলেন। সেদিনই হাঁস দুটোকে জবাই করা হ'ত। কিন্তু আমরা বায়না ধরলাম হাঁস দুটোকে খেলার সাথী হিসেবে পাওয়ার জন্যে। আম্মা আমাদের দু'ভায়ের কথা রাখলেন, তাই জবাই করা হ'ল না ওদের। আমরা মেতে উঠলাম হাঁস দুটোকে নিয়ে। বেশ কেটে যাচ্ছিল হাঁস-হাঁস খেলা খেলে। হাঁসকে না-খাওয়ানো, খাওয়ানো—এ সবকিছুরই ভার নিয়েছিলাম আমরা। যখন হাঁস দুটো তৈ তৈ শব্দ করে পেরিয়ে যেত উঠোন, পালকে রোদ মেখে, ছায়া মেখে, তখন কী-যে ভালো লাগত আমার! কখনো-কখনো আমার হাঁসটাকে কোলে নিয়ে আদর করতাম।

একদিন ইশকুল থেকে এসে খেতে বসলাম। বাসনে ভাত নিয়ে তরকারির জন্য হাত বাড়ালাম ছোট্ট পেয়ালাটার দিকে। তরকারির বাটিতে লালচে শুরুয়া আর কয়েক টুকরো গোশ্‌ত। সুন্দর একটা ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। রান্না বেশ ভালোই

হয়েছে মনে হ'ল। ভাত আর শুরুয়া ভালো ক'রে মেখে নিয়ে মুখে লোকমা তুলতে যাব, এমন সময় ছোট ভাইটা সামনে এসে হাজির। ওর কাঁদো-কাঁদো মুখ দেখে কেমন ভড়কে গেলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?"

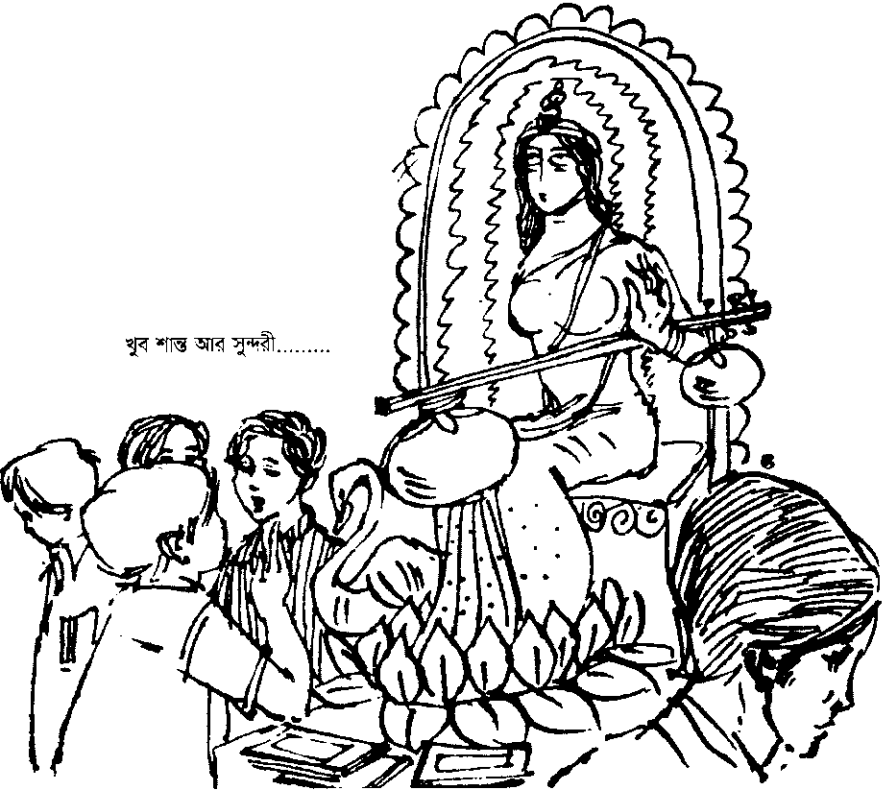

খুব শান্ত আর সুন্দরী.....

"হাঁস দুটোকে জবাই করে ফেলেছে"—ও প্রায় কেঁদে ফেলল। আমি মুখে লোকমা তুলতে পারলাম না। রান্না-করা হাঁসের গোশতের দিকে তাকিয়ে আমার বমি এল। না খেয়েই উঠে পড়লাম। আমার শাদা আপন হাঁসটার কথা ভেবে ভীষণ কান্না পেল। আম্মা কত বললেন খাওয়ার জন্যে, কিন্তু সেদিন কিছুই খেতে পারিনি। শুধু চোখের সামনে ভেসে ওঠে শাদা পালক লাল ঠোঁট। কী করে মুখে তুলব ওর পালক-খসানো, চামড়া-ছাড়ানো মশলা-মেশানো গোশত?

সরস্বতীর শাদা হাঁস যেন উড়ে এল আমার কোলে ওর শাদা ডানা মেলে। আমি আদর করলাম, ও ঠোঁট ঘষল আমার হাতে। না, সরস্বতীকে ফেরত দেব

না ওর হাঁস, আমি বাড়ি নিয়ে যাব। হাঁস আমাকে নিয়ে চলেছে, ওর ধবধবে পিঠের ওপর বসিয়ে নিয়ে চলেছে অনেক ওপর দিয়ে, ঢাকা শহরের অনেক ওপর দিয়ে। সরস্বতীর হাঁস জাদুর গালিচা হয়ে গেছে যেন। জাদুর গালিচা শূন্যে, আমি শূন্যে। হঠাৎ সূর্যকিশোরের ধাক্কায় আকাশের ওপর থেকে ফেরত এলাম নিচে, ইশকুলের মাটিতে। "কীরে, স্বপ্ন দেখছিস নাকি?" সূর্যকিশোরের কথাগুলো আঁচড় কাটল কানের কপাটে। আমি কোনো জবাব দিইনি। একবার সরস্বতীর পায়ের দিকে, আর একবার আকাশের দিকে তাকালাম। মনে হ'ল, দুটো শাদা হাঁস বাতাসে ডানা মেলে আশ্চর্য উড়ে চলেছে তারাভরা আকাশে।

সাত

দূরে থেকে দেখেই ভালো লেগে গেল ওঁকে। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, ভাঙা গাল আর সেই গালভরা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ওঁর গাল দেখে মনে হয়, এমন একফালি জমিন যাতে এইমাত্তর ঘাস গজিয়েছে থোকা-থোকা। ঝুঁকে ব'সে কী যেন একটা আঁকছেন, কাচের ওপর। আমি বাইরে থেকে দেখছি অনেক কষ্ট ক'রে। ভেতরে ঢোকার সাহস নেই। যদি কেউ ধমকে দেয়, যদি ঐ ঝুঁকে বসে-থাকা মানুষটি তাঁর আঁকা ছেড়ে গর্জে ওঠেন আমাকে দেখে। তাই বাইরে থাকাই ভালো। রাস্তার দাঁড়িয়ে দেখলে তো কেউ আর কিছু বলতে পারবে না। আমি দেখছি, তিনি আঁকছেন তো আঁকছেনই। কোনোদিকে খেয়াল নেই তাঁর। শুধু মাঝে-মাঝে সামনে-রাখা ছোট্ট একটা গেলাশ থেকে খেয়ে নিচ্ছেন এক-আধ চুমুক চা।

বাবুর বাজারের একটা দোকান। ফলের নয়, ফুলের নয়, পুতুলেরও নয়। ছোটখাটো দোকান। দোকান-ভরা শুধু কাচ আর কাচ। আর সেই কাচে নানা ধরনের ছবি; নানা লেখা। যিনি রং দিয়ে ওসব লেখা লিখেছেন তাঁর হাতের লেখা নিশ্চয়ই মুক্তোর মতো কিংবা রূপকথার দেশের সবচেয়ে সুন্দর পাখির ছোট্ট ছোট্ট ডিমের মতো সুন্দর। আহ্, আমার হাতের লেখা যদি অমন সুন্দর হ'ত! অমন করে খাতা ভ'রে হাতের লেখা লিখতে পারলে আমাদের ক্লাসের পণ্ডিতমশাই ভারি খুশি হতেন, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আর কী মজার-মজার কথাই লিখেছে সব—"দিন যায় কথা থাকে/সময় যায় ফাঁকে ফাঁকে।" অন্যটিতে লেখা, "সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়/অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।" ভিন্ন একটা কাচ ধ'রে রেখেছে এ-কটি কথা ঃ "পরিশ্রমে আনে ধন পুণ্যে আসে সুখ/আলস্যে আনে দরিদ্রতা, পাপে আনে দুখ।" ব্যবসাদারি কাঠখোট্টা কিছু কথাও আছে—"আজ নগদ, কাল বাকি/বাকির নাম ফাঁকি।" আর আছে আরবি হরফে আঁকা রসূল নামের নৌকায় আল্লাহ নামের সওয়ারি।

ঝুঁকে বসে কী যেন একটা আঁকছেন

আমি সেই কাচের পদ্য আর ছবিগুলো নিয়ে মশগুল এমন সময় আমার কানে ভেসে এল একটা স্বর, বেশ গাঢ়, গমগমে, থমথমে। তিনি আমাকে ডাকছেন, সেই যিনি ঝুঁকে বসে আঁকছেন ছবি, কাচের ওপর। হাত নেড়ে বলছেন ভেতরে আসার জন্যে। রীমিতো ভড়কে গেলাম। বকবে-টকবে না তো? এতক্ষণ ধ'রে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি দেখে হয়তো রাগ করেছেন তিনি। যদি কান মলে দেন কিংবা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেন গালে! আর একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গেল তাঁর হাতের দিকে, যে-হাতে তখন ছবি আঁকাব তুলিটা আনাগোনা করছে কাচের ওপর। পাঞ্জার সাইজটা নেহাত মন্দ নয়; অন্তত আমাকে কাবু করার পক্ষে যথেষ্ট। আমার দিকে না তাকিয়েই তিনি বসতে বললেন আমাকে, তাঁর পাশে। আমার মনের ভয় একটু একটু ক'রে পাখা গুটোতে শুরু করল। বসতে যখন বলেছেন, তখন কিল চড় খেতে হবে না হয়তো।

"তোমার নাম কী খোকা?"—রঙে তুলি ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনি। আমতা-আমতা করে নিজের নামটা উচ্চারণ করলাম কোনোমতে। নিজের নাম

বলতে এমনিতেই খু-উ-ব ভালো লাগে আমার। কিন্তু তখন কিছুতেই শব্দ বেরুতে চাইছিল না আমার গলা থেকে।

"কোথায় থাক?"

"মাহুতটুলিতে।"

"ইশকুলে পড়?"—এবার ছবি থেকে মুখ তুলে আমার হাতের বইখাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"জি হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাসে পড়?"

"ক্লাস সেভেন-এ।"

"শাবাশ!"—তাঁর বড় বড় চোখ দুটো হরিণের মতো নেচে উঠল খুশিতে।

"চা খাবে একটু?"—তাঁর কথায় আদর ঝরছে যেন মধুর ফোঁটা হয়ে।

"জি না।" আমি জবাব দিলাম। এবার কষ্ট হ'ল না কথা বলতে। আমার জবাব শুনে ছোট্ট গেলাশটার সবগুলো চা তিনি খেয়ে ফেললেন এক চুমুকে।

কাচের ওপর ছবি আঁকার ফাঁকে-ফাঁকে তিনি কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে। খুঁটিনাটি কিছু কথা। টুকরো খবর। আমি চোখ বের ক'রে দেখছিলাম তাঁর ছবি আঁকা। ভুরুর মতো একটা নৌকো, রেখার মতো নদীর পাড়, ফুটকির মতো পাড়াগাঁ আর গোল তামার পয়সার মতো সূর্য। দেখে চোখ জুড়োয়। চোখ কুড়োয় গেলাশের পানির মতো ছল্‌কে-ছল্‌কে-ওঠা খুশি। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের কথা, যেখানে সবসময় যাওয়া হয় না; কখনো-সখনো যাই। মনে পড়ে, মেথিকান্দা স্টেশন, মেঘনা নদী, আর ভীষণ পাগলি মেঘনা নদীতে ভেসে-চলা নৌকো। নদীর তীরঘেঁষা পলাশতলির কাজলা কিনারের কথাও মনে পড়ে, আর মনে পড়ে আলুঘাটার কথা। আলুঘাটায় নামলেই পাড়াতলি। আমাদের গ্রাম। মনে পড়ে, নৌকোর গুলুইয়ে দাঁড়িয়ে আব্বা, কোনখানে নৌকো ভেড়াতে হবে, মাঝিদের বুঝিয়ে বলেছেন, আম্মাকে সাহায্য করছেন নৌকো থেকে ডাঙায় নামতে। আমাদেরও নামাচ্ছেন একে একে। পাড়াতলির মাটিতে পা রাখলেই আব্বা হয়ে যেতেন আলাদা এক মানুষ। আব্বার খুশি-ভরা মুখ দেখে ভারি ভালো লাগত আমার।

পাড়াতলি, আমাদের ছোট্ট সুন্দর গ্রাম। বাঁশবন। গাছ থেকে ভেসে-আসা মন-কেমন-করা ঘুঘুর ডাক। মাঝির হাঁক। দুপুরে পুকুরে ডুব। বিকেলে আমতলায়, জামতলায়, বিকেলে মাঠের শাঁইশাঁই হাওয়ায়, বিকেলে খই দই নিয়ে ঘরের দাওয়ায়, বিকেলে শর্ষেক্ষেতের ধারে, বিকেলে হলদে আলোয় আলের ওপর দে ছুট। বাজারে বাতাসা। খুব ক'রে খাও একচোট। রাতে খাওয়া সেরে

ঘুমোনো। ঘুমোনোর আগে অনেকক্ষণ ধ'রে ভয় পাওয়া। তখন চোখের সামনে বাঁশবন, ঝোপঝাড়, থমথমে বাদুড়মুখো অন্ধকার। আলতা বাদুড় চালতা বাদুড়, কাল বাদুড়ের বে'। বাদুড়ের ছড়া মনে পড়তেই ভয়ের ভেতরও ফিক ক'রে হেসে ওঠা, তারপর ডাইনির চুল। আবার ভয় পাওয়া। জানালা-পেরুনো হঠাৎ-হাওয়া। মশার বনবন্। পাড়া নিঝুম। ঝিঁঝির ঘুঙুরে একটানা মিষ্টি ঝনঝন বোল। তারপর ঘুম। ঘুমের সমুদ্দুর।

"কী ভাবছ?"—প্রশ্নের ধাক্কায় চমকে উঠলাম। তারপর সামনে গিয়ে, একটা ঢোক গিলে বললাম, "না, কিছুই ভাবছি না। আপনার আঁকা ছবি দেখছি। নৌকোটা খু-উ-ব ভালো লাগছে আমার।"

"এবার দ্যাখো নৌকোর ওপর একটা মাঝি"—এ ব'লে সেই ছবি-আঁকিয়ে নৌকোর ওপর একরত্তি চমৎকার একজন মাঝিকে বসিয়ে দিলেন। আমি তাজ্জব। কী আজব এই আঁক-আঁকা খেলা! এই একটু আগেও কোথাও কিছু ছিল না, একটানে হয়ে গেল অনেক কিছু। এই খেলা সারাবেলা খেললেও যেন একটুও বিরক্তি ধরবে না।

তিনচার দিন যাওয়া-আসার পর বেশ ভাব হয়ে গেল নঈম মিঞার সঙ্গে, মানে কাচের ওপর তুলি বুলিয়ে আপনমনে যিনি ছবি আঁকেন চা খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর সঙ্গে। তিনি ছবি আঁকতেন একটার পর একটা আর আমি ব'সে ব'সে দেখতাম তাঁর লম্বা লম্বা আঙুলগুলোর নাচ। এক মুহূর্তে তৈরি হচ্ছে গাছপালা, পাখপাখালি, মেঘমেঘালি, মাঝির লগি, ছলছলে পানির ঢেউ, আমার নানির রূপোলি পানের ডিবের মতো চাঁদ, গাঁদাফুলের মতো বেলা-ডুবুডুবুর সূর্য, আরও কত্ত কী! আমাকে তাক ক'রে দেয়ার জন্যেই যেন বড্ড তাড়াতাড়ি তুলি চালাতেন তিনি। ওসব ছবি দেখার ফাঁকে-ফাঁকে মনে একটা ভাবনা উঁকিঝুঁকি দিত, "আমিও যদি নঈম মিঞার মতো এই দোকানটায় ব'সে ব'সে আপনমনে অমন সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে পারতাম।"

একদিন সাহস ক'রে বলেই ফেললাম কথাটা। বলার আগে অবিশ্যি, সাত-পাঁচ ভাবলাম অনেকক্ষণ। একরাশ গোলাপি রঙের মতো লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল আমার চোখেমুখে। কিন্তু তবু আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "আমাকে ছবি আঁকা শেখাবেন?"

"তুমি ছবি আঁকা শিখবে?"—আমার দিকে তাঁর বড় একজোড়া চোখ মেলে দিলেন নঈম মিঞা।

"জি।"

"কী করবে ছবি আঁকা শিখে?"

"এই আপনার মতো ছবি আঁকব দোকানে ব'সে ব'সে।"

"হুম", নঈম মিঞা তাঁর কাঁচাপাকা লম্বা লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে একটা আবছা শব্দ করলেন।

"আমি এই কাচের ওপর একটা নৌকো বানাব?"—অনুমতি চাইলাম নঈম মিঞার কাছে। আমার দিকে না তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে আমার নৌকো বানানোয় তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আমি তো হাতে বেহশ্‌ত পেয়ে গেলাম। চট ক'রে একটা তুলি রঙে ডুবিয়ে নিয়ে পোঁচ লাগালাম কাচের ওপর। দেখতে দেখতে একটা নৌকো হয়ে গেল। সেই নৌকোয় পালও খাটিয়ে দিলাম একটা। নেহাত মন্দ হ'ল না। হাওয়ায় ফুলে উঠেছে শাদা পাল। আমার বোন মেহেরের ফোলা গালের মতো অনেকটা। কিন্তু নঈম মিঞার মুখ কেমন ভার-ভার দেখাল তখন—যেন মেঘ-ঢাকা আকাশ। এখুনি ঝড় উঠবে।

সেদিন খুশি-ভরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, সারা রাস্তা প্রায় লাফাতে লাফাতে। পরের দিন আগের চেয়ে অনেক আগেই হাজির হলাম বাবুর বাজারের সেই ছোট কাচের দোকানে। কিন্তু সেদিন নঈম মিঞা বড্ড বেশি চুপচাপ। আমাকে বসতে পর্যন্ত বললেন না। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একঠায়। নট নড়নচড়ন। আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নঈম মিঞা বললেন, "ইশকুল নেই তোমার?"

"আজ ইশকুলে যাব না।"

"কেন?"

"এমনিতেই। অনেকক্ষণ ছবি আঁকব।"

"ভালো ছেলেরা ইশকুল কামাই করে না।"—নঈম মিঞা বললেন।

"আমি ছবি আঁকব।"

"তুমি কাল থেকে আর এসো না এখানে।"

"কেন?"

"তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে, এখানে এই বাজে দোকানে বসে বসে কাচের ওপর নৌকো বানানো তোমার কাজ নয়।"—চায়ের ছোট্ট গেলাশটা হাতে চেপে ধ'রে বললেন নঈম মিঞা, আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে। তাঁর গলার আওয়াজে ব্যথা বেজে উঠল। যেন কেউ তাঁকে খুব জোরে আঘাত দিয়েছে, তাঁর ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠছে, নিশুতরাতের পায়রার শব্দের মতো। তাঁর লম্বা লম্বা কাঁচাপাকা চুল-ভরা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে কাচের ওপর। হাত নড়ছে না। কাচে ছবি নেই। সব শাদা। থান-কাপড়ের মতো। আমার ভারি কান্না পেল তখন। কিছু না বলে আমি নেমে এলাম রাস্তায়। পেছনে রইল প'ড়ে বাবুর বাজারের সেই কাচের দোকান, যেখানে ঝুঁকে ব'সে আপনমনে নৌকো বানান, নদীনালা,

গাছপালা বানান, বানান মেঘমেঘালি, পাখ-পাখালি, বানান নঈম মিঞা, আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে।

আর কোনোদিন যাইনি সেই দোকানে। তবে ইশকুলে যাওয়ার পথে কখনো-সখনো দেখতাম, নঈম মিঞা ঝুঁকে ব'সে ছবি আঁকছেন কাচের ওপর। তখন কেমন রোগা-রোগা লাগত তাঁকে। ভাঙা গালে কাঁচাপাকা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, যেন শ্যাওলা-পড়া দেয়াল। একটা কাশির আওয়াজও ভেসে আসত মাঝে-মাঝে। অসুখ করেছে নাকি নঈম মিঞার? ভাবতাম, একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু ধমক খাওয়ার ভয়ে পা বাড়াতাম না আর। বাবুর বাজারের সেই ফলের নয়, ফুলের নয়, পুতুলেরও নয়, শুধু কাচের দোকানে আর যাইনি। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি সেই ছোট্ট ঘরটাকে আর সেই ঘরের শিল্পী আমার প্রিয় ছবি-আঁকিয়ে নঈম মিঞাকে। সত্যি, আজও তাঁকে একরত্তি ভুলিনি।

অনেক বাড়ীতেই ছিল ভিস্তির আনাগোনা

আর ভুলিনি সেই ভিস্তিকে, যে রোজ মশক ভ'রে দুবেলা পানি দিয়ে যেত আমাদের বাড়িতে। তখন ঢাকায় পাড়ায়-পাড়ায় বাড়িতে-বাড়িতে কল ছিল না পানির। তাই অনেক বাড়িতেই ছিল ভিস্তির আনাগোনা। কালো মোষের পেটের মতো ফোলা-ফোলা মশক পিঠে ব'য়ে আনত ভিস্তি। তারপর মশকের মুখ খুলে পানি ঢেলে দিত মাটি কিংবা পেতলের কলসের ভেতর।

যে-ভিস্তিটা আমাদের বাড়িতে পানি দিত ওর নাম কিন্তু আমার মনে নেই। মনে আছে ওর থ্যাবড়া নাক, মাথার কিস্তিটুপি, মিশমিশে কালো চাপদাড়ি আর কোমরে জড়ানো পানি-ভেজা গামছার কথা। মশকের কথা তো মনে আছেই। মনে পড়ে, ভিস্তিটার হাতে বেরিয়ে থাকত সরু নদীর মতো শিরা। আমাদের সেই ভিস্তি গপ্পে ছিল খুব। অল্প সময়ের জন্যে আসত সে, কিন্তু গালগল্পে মাতিয়ে রাখত বাড়ির চাকর-বাকরদের। সেই গল্পের ভাগ আমরাও পেতাম একটুআধটু। আসত সে ভরা, ফোলা-ফোলা মশক পিঠে ব'য়ে, ফিরে যেত মস্ত চুপসে-যাওয়া, হাওয়া-নেই বেলুনের মতো মশকটা কাঁধে ঝুলিয়ে। মশকটাকে ওর শরীর থেকে আলাদা কিছু ব'লে ভাবতে পারতাম না। মনে হ'ত, ওটা বুঝি ওর শরীরেই গজিয়ে উঠেছে।

একদিন পানির কল এল আমাদের মাহুতটুলির বাড়িতে। আর সেইসঙ্গে বিদায় নিল ভিস্তি। যেদিন শুনলাম পিঠে মশক ব'য়ে ভিস্তি আর আসবে না আমাদের বাড়িতে, সেদিন ভারি মন-খারাপ হয়ে গেল আমার। পানির কল তো আর মজার মজার গল্প শোনাতে পারবে না! সেদিন বারবার মনে পড়ছিল ভিস্তির কথা। ভিস্তি চ'লে যাওয়ার দিন মনে হ'ল, আমার কোনো আপনজন যেন চিরদিনের মতো চ'লে গেছে আমাদের এই চেনা দুনিয়া ছেড়ে। সেই ভিস্তির নাম মনে নেই, কোথায় সে থাকত তাও জানি না, তবে মনে আছে ওর মুখ, আর জানি কোনোদিন সেই হাসিখুশি মুখের ছবি মুছে যাবে না আমার মন থেকে, যেমন যাবে না নঈম মিঞার মুখের ছবি আর তাঁর নিজের আঁকা ছবি—সেই গাছগাছালি, পাখপাখালি আর মেঘমেঘালি, সেই পালতোলা নৌকো, দূর থেকে দেখতে-পাওয়া চর আর চরের ওপর খয়েরি রঙের খড়ে-ছাওয়া কাজল কুঁড়েঘর।

আট

সেই ছেলেবেলা থেকেই পথ হাঁটতে আমার ভালো লাগে। আলোজ্বলা পথ, ছায়ার ঘোমটা-ঢাকা পথ, সুনসান পথ, ফেরিঅলার গলার আওয়াজে চমকে-ওঠা পথ—সবরকমের পথ বেয়ে হেঁটে যেতে ভালোবাসি আমি। মাহুতটুলি থেকে বেশি দূরে যেতে দেয়া হ'ত না আমাদের। এমনিতেই ঘরের বাইরে বেরুনো মানা ছিল। খুব

বায়না ধরলে কাছেধারে যাওয়ার অনুমতি পেতাম কখনো-সখনো। তাই ঘরের বাইরে পা বাড়ানোটাই ছিল খুশির ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটো, চোখ ভরে দ্যাখো চারদিকের নানা জিনিসপত্তর। একবার দেখে সাধ না মিটলে দশবার দ্যাখো, কেউ বারণ করবে না। বারণ করার কোনো কারণও তো নেই।

মাহুতটুলির রাস্তা, সাতরওজা আর আরমানিটোলার পথ, নয়াবাজার, বাবুর বাজার, ইসলামপুর, চকবাজার, নবাবপুর, পাটুয়াটুলি, তাঁতিবাজার—কত্ত পথ, কত্ত সুন্দর সুন্দর রাস্তা, কত্ত অলিগলি। কার না ভালো লাগে এসব পথে হেঁটে বেড়াতে? সাতরওজার সেই কেমন-গন্ধ-ভরা রাস্তায় কতবার হেঁটেছি, কখনো কারণে, কখনো-বা অকারণে। অকারণেই বেশি। বাকরখানি রুটির একটা দোকান ছিল সাতরওজার কাছে। চমৎকার রুটি বানানো হ'ত সেই দোকানটায়। মাঝে-মাঝে সকালবেলায় হাজির হতাম সেখানে, রুটি কেনার জন্যে। এক পয়সায় একটি। রুটি হাতে এলেই দে ছুট। বাসায় গিয়ে পেট পুরে খাও। আহ্, কী মজাই-না লাগত বাকরখানি রুটি খেতে! মাঝে-মাঝে আব্বা ফরমায়েশ দিয়ে পনিরি রুটি বানাতেন আমাদের জন্যে। বাকরখানির গা' জুড়ে সাজানো থাকত পনিরের কুচি। মনে হ'ত বাদামি আকাশভরা তারা। দেখেই চোখ জুড়োয়। দেখার সুখ ফুরোয় না কিছুতেই।

সাতরওজার সেই রাস্তার ধারে ছিল একটা আস্তাবল। কতকগুলো আধমরা, হাড়জিরজিরে ঘোড়া ছিল সেই খড়ভরা আস্তাবলের বাসিন্দা। ঘোড়াগুলোর পাশেই খড়ের গাদায় শুয়ে থাকত একটা লোক। সেই লোকটার শরীর ঘোড়াগুলোর চেয়ে ভালো ছিল, বলা যায় না। লোকটা কখনো-সখনো ঘোড়াগুলোর গা রগড়ে দিত। কোনো-কোনোদিন দেখতাম, ঘোড়ার খুরে লোহার নাল লাগানো হচ্ছে ঠুকঠাক শব্দ ক'রে। ঘোড়াগুলোর চুল ছাঁটারও বন্দোবস্ত ছিল, মনে পড়ে। এই নাল ঠোকা ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে মোটেই সুবিধেজনক ঠেকত না। মনে হ'ত, ঘোড়াগুলোর ওপর জুলুম করা হচ্ছে। অথচ ঘোড়ার গাড়িতে চ'ড়ে যখন হৈচৈ খুশিতে ঘুরে বেড়াতাম নানা জায়গায় ময়মুরুব্বির সঙ্গে, তখন হাড়জিরজিরে, বেদম চাবুক-খাওয়া ঘোড়াগুলোর কষ্টের কথা একটুকুও মনে থাকত না আমার।

সাতরওজার রাস্তার ধারে ছিল অনেক কিছু। আস্তাবল, বাকরখানি রুটির দোকান, দরজির দোকান, মাজার, মুদির দোকান। আর ছিল একটা বিস্কুটের দোকান। সেই দোকানটার ধার-ঘেঁষে হাঁটলে কেমন টক টক গন্ধ লাগত নাকে ঠিক টক নয়, টক-মিষ্টি গন্ধ বলা যেতে পারে। পথচলার সময় দেখতাম, দু'জন লোক বিস্কুট তৈরি করছে। ওদের বেশ গুণীজন ব'লে মনে হ'ত আমার। ময়দ

দিয়ে কী সুন্দর সুন্দর বিস্কুটই-না তৈরি করছে ওরা! আহা, আমিও যদি রাশি রাশি বিস্কুট বানাতে পারতাম ওদের মতো!

ঘোড়াগুলোর পাশেই খড়ের গাদায় শুয়ে থাকতো একটা লোক

সত্যি বলতে কি, বিস্কুট বানাতে না পারার দুঃখে আমার মন ভীষণ ভারী হয়ে উঠত—ভিস্তির সেই পানিভরা কালো মশকের মতো। না, আমি কোনো কাজেরই নয়। আবু তাহেরের মতো অঙ্ক কষতে পারি না, সূর্যকিশোরের মতো ব্লেড চিবিয়ে খেতে পারি না, ঘুসি মারতে পারি না তারার মতো, ঐ সহিসটার মতো ঘোড়ার গা রগড়ে দিতে পারি না, বিস্কুট বানাতে পারি না—কিছুই পারি না আমি। বিস্কুটের দোকানের কারিগররা হয়তো ভাবত, আমি ছ্যাচ্চড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি বিস্কুটের লোভে। লোভী বালক ভেবে ওরা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাত, অন্তত আমার তা-ই মনে হ'ত তখন। সেই বিস্কুট খাওয়ার জন্যে খুব একটা লোভ হ'ত, এমন নয়। লোভে জিভের ডগায় পানি আসত না। তবে আমার চোখ চকচকে হয়ে উঠত বলে মনে হ'ত। কারণ তখন এমন বোধ করতাম যে আমার চোখের কোটরে একজোড়া চোখ নেই আর, ওদের জায়গা দখল

করেছে দুটো জ্বলজ্বলে তারা। অবিশ্যি বিস্কুট খাওয়ার লোভে নয়, বিস্কুট বানানো দেখার লোভে। ঐ দোকানের বিস্কুটগুলোর চেয়ে অনেক ভালো বিস্কুট আব্বা কিনে আনতেন হরহামেশা। দু'জন লোক তাল তাল ময়দা দিয়ে রাশি রাশি বিস্কুট বানাচ্ছে, এইটে দেখতে বড্ড ভালো লাগতো আমার।

আর ভালো লাগত মাহুতটুলির রাস্তায় ঘুরে-বেড়ানো একটা লোককে। আপনমনে সে বিড়বিড় করত সারাদিন। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিত ছেঁড়া কাগজ, পাথরের নুড়ি, এমনি সব কুটুম-কাটম। ওর গায়ে ছিল হাজার তালিমারা একটা জামা। রঙবেরঙের কাপড়ের টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে যেন জামাটা বিশেষ ক'রে বানানো হয়েছে ওরই জন্যে। ওকে দেখলেই মনে হ'ত, কী যেন একটা হন্যে হয়ে খুঁজছে সে সবসময়। ওর চাল নেই, চুলো নেই। মাথা-ভরা একরাশ জট-পাকানো চুল আছে, আর সেই চুলে আছে রাজ্যির ধুলো। ওর হাতে একটা বাঁশি আর মাথায় লম্বা টুপি দিয়ে দিলেই ওকে যে হ্যামেলিন শহরের সেই বাঁশিঅলার মতো মনে হ'ত, তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। রাস্তাই ছিল ওব বাড়ি। রোদ-বৃষ্টি, জ্যোৎস্না-অন্ধকার, ধুলো-হাওয়ায় মেশা পথ চলাতেই তার খুশি। আমাদের মাহুতটুলির পথের একটা অংশ বলেই মনে হ'ত ওকে। ও না থাকলে সমস্ত রাস্তাই ফাঁকা। রাজা না থাকলে যেমন সিংহাসন ফাঁকা, ঠিক তেমনি।

একদিন সেই হাজার তালিমারা জামার মালিক, পথের রাজা কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কাউকে কিছু না বলে। বলবেনই-বা কী করে? কোনো লোকের সঙ্গেই তো কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু কথা বলতেন রোদ্দুরের সাথে, হাওয়ার সাথে, আকাশে ভেসে-বেড়ানো মস্ত পাখির পালকের মতো মেঘের সাথে। তিনি কোনদিকে গেলেন, কোন দেশে গেলেন, কত কাছে গেলেন কিংবা কত দূরে গেলেন, কেউ জানল না। আমিও জানতে পারিনি।

ওর খবর কারুর কাছে নেব, তারও জো নেই। সেই বিড়বিড়-করে-বেড়ানো লোকটার খোঁজ নিতে বাধোবাধো ঠেকত। লোকে কী ভাববে, এই ভয়ে ওর কথা কাউকে জিজ্ঞেস না করে চোখ বুলোতাম রাস্তার চারদিকে—এ-কোণে ও-কোণে। কিন্তু সেই ধুলোমাখা মাথা নেই, হাজার তালিমারা জামা নেই, সেই হ্যামেলিনের বাঁশিঅলা হ'তে-পারত লোকটা নেই কোথাও। একদিন সব বাধা ঠেলেঠুলে মুদি দোকানের মালিককে জিজ্ঞেস করলাম, "ঐ হাজার তালিমারা যার গায়ের জামা সে কোথায় গেছে বলতে পারেন?"

মুদি আমার দিকে তাকাল, বাঁকা চোখে, রাগী চোখে। "কী দরকার অর লগে, হুনি?" মুদির প্রশ্নটা যেন ঠোকর মারল আমাকে। আমি আমতা-আমতা করতে লাগলাম, ঠিক যেমন নামতা ভুলে যাওয়ার সময় করতাম। মুদি আবার ঠোকরাল

আমাকে, মানে ওর কথা দিয়ে ঃ "অই পাগলা তো আমাগো কাছে আর ঠিকানা রাইখা যায় নাই যে তুমারে কইয়া দিমু।" বুঝলাম, মুদি সাহেব চটেছেন খুব। তাই মুদির দোকান থেকে স'রে দাঁড়ালাম। এরপর মুদিকে দেখছি অনেকবার, দু'একটা সওদাও কিনেছি, কিন্তু যার কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম ওর কাছে তাকে কোনোদিন দেখিনি আর।

কোনো কোনো দিন ঘুরতে ঘুরতে চ'লে যেতাম চকবাজারে। চকবাজারের খুব কাছাকাছি ছোট কাটরা ও বড় কাটরা। চকবাজারে গেলেই চোখে পড়ে বড় মসজিদ, অনেক দিনের পুরোনো। চকের বিরাট মসজিদটা তৈরি করেন শায়েস্তা খাঁ। শোনা যায়, তিনি এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসতেন। চকবাজারে রকমারি দোকান। রুটি, কাবাব, কাপড়চোপড়, টুপি, সুর্মা, আতর, মাদার মেঠাই—যা চাও তা-ই পাবে। ছোট কাটরায় বিবি চম্পার কবর। কে এই বিবি চম্পা? ভারি সুন্দর নাম। ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়ানো যেন সেই নামে। কেউ বলেন, বিবি চম্পা ছিলেন শায়েস্তা খাঁয়ের মেয়ে; কেউ বলেন, তিনি শায়েস্তা খাঁর বাঁদি।

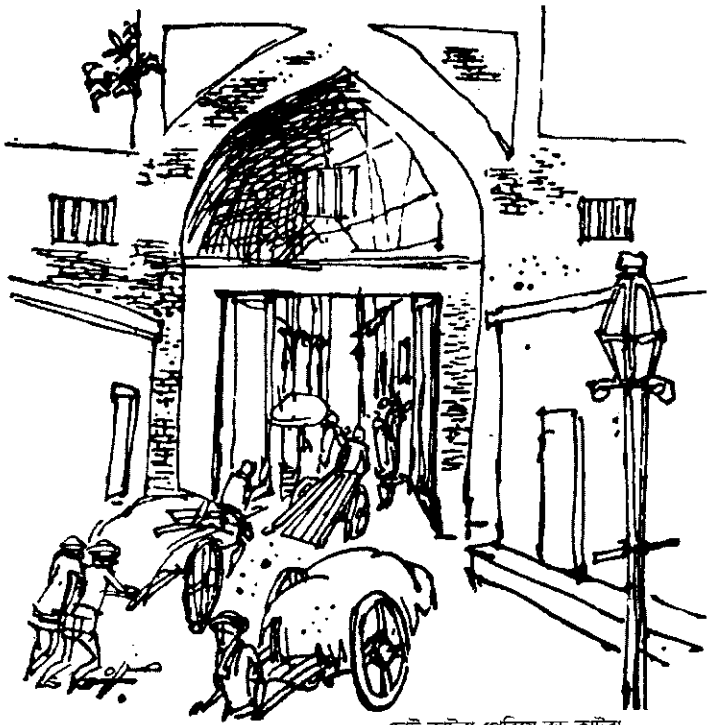

ছোট কাটরা পেরিয়ে বড় কাটরা

ছোট কাটরা পেরিয়ে বড় কাটরা। ঘিঞ্জি এলাকা। ঠেলাগাড়ির ঠেলাঠেলি, লোকজনের ভিড়, অনেক গলার আওয়াজ। ভাবতে অবাক লাগে, এখানে একসময় সেপাই-সান্ত্রির কুচকাওয়াজ হ'ত। সেই কবেকার মোগল যুগের লোকজন সব চলাফেরা করত এসব জায়গায়। নিশ্চয়ই ওরা নানা গালগল্প করত চকবাজারে, ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে ঘুরে বেড়াত ছোট কাটরায়, বড় কাটরায়। বড় কাটরায় ভাঙাচোরা দালান দেখে মনে হয়, ইতিহাসের কত ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরি ১০৫৫) বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটা মস্ত সরাইখানা তৈরি করেন সম্রাট শাহাজানের ছেলে শাহ সুজা। শাহ সুজার হুকুমে মীর-ই-ইমারত আবুল কাসেমের হাতে বড় কাটরা তৈরির কাজ শেষ হয়। এই আলিশান দালানে শাহ সুজার বসবাস করার কথা ছিল। কিন্তু দালানের কাজ শেষ হওয়ার পর সেখানে মন বসল না তাঁর। শাহ সুজার মহল হওয়ার কথা ছিল যার, শেষ পর্যন্ত তা হ'ল মুসাফিরদের আস্তানা। একদা খুবই সুন্দর ছিল এই বড় কাটরার দরদালান। বড় কাটরার ফটক দেখলে এতদিন পরে এখনও সেসব দরদালানের রূপ কিছুটা আন্দাজ করা চলে।

একসময় বড় কাটরার তোরণে ফারসি ভাষায় লেখা একটা পাথরের ফলক ছিল, এখন তার কোনো চিহ্ন নেই। ফলকের লিপিটি লিখেছিলেন শাদুদ্দিন মুহম্মদ সিরাজি। ফলকে লেখা ছিল ঃ

"সুলতান শাহ সুজা সবসময় দান-খয়রাতে মশগুল থাকিতেন। তাই খোদার করুণালাভের আশায় আবুল কাসেম তুব্বা হোসায়নি সৌভাগ্যসূচক এই দালানটি নির্মাণ করিলেন। ইহার সঙ্গে ২২টি দোকানঘর যুক্ত হইল—যাহাতে এইগুলির আয়ে ইহার মেরামতকার্য চলিতে পারে এবং ইহাতে মুসাফিরদের বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থা হইতে পারে। এই বিধি কখনো বাতিল করা যাইবে না। বাতিল করিলে অপরাধী শেষ বিচার দিনে শাস্তি লাভ করিবে। শাদুদ্দিন মুহাম্মদ সিরাজি কর্তৃক এই ফলকটি লিখিত হইল।"

বড় কাটরার আগেকার সেই জৌলুশ আর নেই। এখন সেখানে নেই ঘোড়সওয়ারদের আনাগোনা। শাহি আওয়াজ নেই, নেই সৈন্যসামন্তের কুচকাওয়াজ। সময় খাবলা মেরে মেরে বড় কাটরার দরদালান থেকে খসিয়ে নিয়েছে তার রূপ অনেকখানি। এখন সেখানে ঠেলাগাড়ির ভিড়, কুলির ভিড়। কেউ সওদা বেচছে, কেউ কিনছে। দরাদরি, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, চেল্লাচেল্লি—সবকিছুই চলছে সেখানে। বহু বছরের ধুলো, বহু বছেরর রোদবৃষ্টি, বহু বছরের জ্যোৎস্না আর অন্ধকারের দাগ লেগে রয়েছে বড় কাটরার গায়ে। ধুলো বলছে, শোনো, বড় কাটরার কিস্‌সা শোনাই তোমাদের।' শ্যাওলা বলছে, 'শোনো বলি,

আমার কথা।' পুরোনো ইটের ফাঁকে-ফাঁকে লুকিয়ে-থাকা, শুকিয়ে-যাওয়া জ্যোৎস্নাও তার কাহিনী শোনানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু, কে শুনবে ওদের কথা? কিছুক্ষণের জন্যে হয়তো কেউ দাঁড়ায় বড় কাটরার ফটকের সামনে, চোখ বুলোয় আগাছাভরা ভাঙাচোরা দেয়ালে। তারপর চ'লে যায়, এই যেমন আমি ছেলেবেলায় চ'লে আসতাম পুরোনো বড় কাটরায় পুরোনো রূপ দু'চোখ ভ'রে লুট ক'রে।

নয়

এখনও কোনো কোনো দিন মনে হয়, ঐ তিনি ব'সে রয়েছেন সেখানে। কোনো হৈচৈ নেই, কোনো হাঁকডাক নেই। তিনি ব'সে আছেন চেয়ারে হেলান দিয়ে, হুঁকোর নল ঠোঁটের এক কোণে এলানো। এদিকে বেলাও এলানো। বিকেলকে মনে হচ্ছে একটা হলদে পাখির মতো, যে-পাখি ডানা ঝেড়ে ঝেড়ে শুধু হলুদ রং ছড়াচ্ছে চারদিকে। তিনি ব'সে আছেন সেই ঝরে-পড়া রঙের ভেতর। তিনি, মুন্সী আফতাবউদ্দীন আহমদ। আমার নানা। তিনি ব'সে আছেন বিকেলবেলা, চেয়ারে হেলান দিয়ে। তাঁর হাতে খবরের কাগজ নেই, বইও নেই। এমনিতেই ব'সে আছেন তিনি। কোনো সাড়া নেই, নেই কোনো তাড়া। মাঝে-মাঝে শুধু হুঁকোর হালকা শব্দ হচ্ছে গুড়গুড়। এই তো কিছুক্ষণ আগে টাইপরাইটারে একটা কাগজ চাপিয়ে কী যেন টাইপ করছিলেন। ইয়া বড় টাইপরাইটার! কালো তার গায়ের রং। নানা যখন তাঁর আঙুল চালিয়ে দিতেন হরফ-আঁকা বোতামগুলোর ওপর কেমন মজাদার শব্দ হ'ত—টক্, টক্, টক্। টাইপরাইটারটাকে খুব ভালোবাসতেন আমার নানা। কাউকে ছুঁতে দিতেন না, নিজের হাতে ধুলো ঝাড়তেন একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে। কখনো-কখনো দেখতাম, বন্ধ-টাইপরাইটারের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আপনমনে। যেন আমাদের কারুর গায়ে হাত বুলোচ্ছেন তিনি।

আজও কোনো কোনো দিন মনে হয়, তিনি ব'সে আছেন সেখানে। আমাদের মাহুতটুলির বাসার উঠোনে একটা খেজুরগাছ ছিল। নানা সেই গাছের কাছেই চেয়ার পেতে বসতেন রোজ বিকেলে। আমাদের উঠোনে সেই খেজুরগাছ অষ্টপ্রহর থাকত এক পায়ে দাঁড়িয়ে। না, মাছ খাওয়ার আগে বকমামার মতো নয়, দরবেশের মতো মনে হ'ত তাকে। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া পাতা, যেন মস্ত ছাতা। খেজুরগাছটা কারুর কাছে মাথা নোয়াতে শেখেনি। সোজা শিড়দাঁড়ার গাছ কিনা, তাই।

সকালের দিকে একটা লোক আসত মাটির ঘড়া আর কাঁচি নিয়ে। ঘড়াভরা খেজুরের রস নামিয়ে আনত আমাদের উঠোনের সেই গাছ থেকে। লোকটা যখন গাছ বেয়ে উঠত, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম ওর দিকে। মনে হ'ত যেন কোনো বাজিকর খেলা দেখাচ্ছে। পায়ে পাতার বেড়ি, কোমরে ধারালো কাঁচি। চোখ ভ'রে দেখতাম ওর ওঠা-নামা। খেজুরের রস পছন্দ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমার একজোড়া চোখ

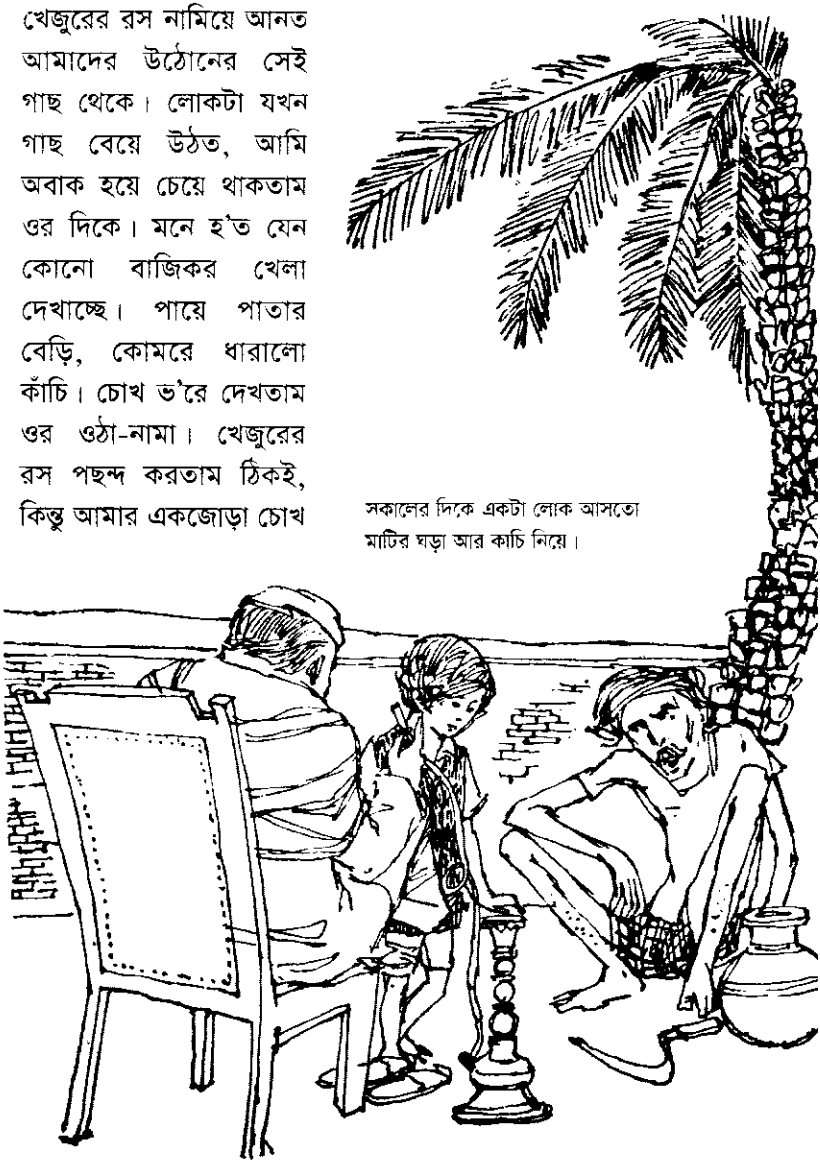

সকালের দিকে একটা লোক আসতো মাটির ঘড়া আর কাচি নিয়ে।

প'ড়ে থাকত ওর মাথার পাগড়ি আর কোমরে-ঝোলোনো ঝকঝকে কাঁচির ওপের। যদি একবার হাতে নিতে পারতাম সেই ধারালো কাঁচিটা, কত ভালোই-না লাগত আমার! তখন মনে হ'ত, 'গাছি' হওয়ার মতো সুখ আর নেই।

গাছি চ'লে গেলে আমি দুটো গামছা নিয়ে একটা মাথায় বাঁধতাম পাগড়ির মতো, আরেকটাকে বানাতাম খাটো ধুতি। তারপর নানির চোখকে ফাঁকি দিয়ে রান্নাঘর থেকে তরকারি কাটার ছুরিটা এনে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতাম কোমরে। এবার গাছে ওঠার পালা। প্রাণপণ চেষ্টা করতাম গাছে ওঠার জন্যে। এক চুলও এগোতে পারতাম না। শুধু খেজুর গাছের কোমর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম নিচে, চোখ দুটো ওপরের দিকে—যেখানে ঘড়ার ভেতর চুঁইয়ে পড়ছে খেজুরের রস। আমি তো আর সত্যিকারের গাছি নই যে তরতর ক'রে উঠে যাব গাছের চূড়োয়, নিয়ে আসব রসভরা ঘড়া! গাছ বেয়ে উঠতে পারতাম না বলে প্রায় কান্না পেত আমার। নানি আমাকে ঐ বেশে দেখে লুটিয়ে পড়তেন হেসে। বাড়ির সবাইকে ডেকে বলতেন, "দ্যাখো দ্যাখো, আবার গাছি এসেছে আমাদের বাড়িতে।" আমি তো দে দৌড়, একছুটে একেবারে বৈঠকখানায়।

আজও ভুলতে পারিনি সেই এক পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঝাঁকড়া পাতাঅলা খেজুরগাছের কথা। নানি বলতেন, খেজুরগাছটা নাকি আমার সমান বয়সী। তাই কেমন যেন লাগত সেই খেজুরগাছের দিকে তাকালে—ভাবতাম, আমাদের দু'জনের একই বয়স, অথচ কত আলাদা আমরা। কিন্তু আলাদা হ'লে কী হবে, ওর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। যেন সে আবু তাহের কিংবা সূর্যকিশোর। তবে সে ওদের মতো কথা বলতে পারে না, দৌড়ুতে পারে না, পারে না গোল্লাছুট কিংবা চোর-পুলিশ খেলতে। শুধু দাঁড়িয়ে থাকে অষ্টপ্রহর, মাঝে-মাঝে ঝাঁকায় মাথা ইশকুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো। যেন ওর মাথায় কত রাজ্যির বুদ্ধি।

আজও দেখি, খেজুরগাছের খুব কাছে চেয়ার পেতে ব'সে আমার নানা। ওঁরা দু'জনে—খেজুরগাছ ও মুন্সী আফতাবউদ্দীন আহমদ বারবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান আমার ছেলেবেলায়। আজ ওঁরা কেউ নেই, কিন্তু তবু আমি ওঁদের দু'জনকেই দেখি একসঙ্গে। আর দেখি আমরা ক'জন ছেলেমেয়ে জটলা পাকাচ্ছি সেই খেজুরগাছের নিচে। এইমাত্র কার যেন একটা দাঁত পড়েছে, আমরা সেই দাঁত নিয়ে হৈ-হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়েছি গাছতালায়। "ইঁদুর, ইঁদুর তোমার দাঁতটা দাও, তার বদলে এই আমারটা নাও" বলেই ছোটো ইঁদুরের গর্তের খোঁজে। একটা ভাঙা বিচ্ছিরি দাঁতের বদলে নতুন, চকচকে একটা দাঁত পাওয়ার আশায় খুশিতে আমরা সবাই দিশাহারা। ইঁদুরের গর্তে পুরোনো দাঁত ছুঁড়ে ফেলার পরও যখন তার বদলে ইঁদুর নতুন দাঁত দিল না তখন সবারই মন-খারাপ। আবার

খেজুরগাছের নিচে জটলা। কেউ বলে, "একটু পরে ইঁদুর নিশ্চয়ই দাঁত দিয়ে যাবে।" কেউ আবার ইঁদুরের ওপর ভীষণ খাপ্পা। তাই ওর মুখ থেকে বেরোয়, "আমাদের বাড়ির ইঁদুরগুলো পাজির একশেষ। দেখে নিয়ো, কখনো নতুন দাঁত নিয়ে আসবে না।" যার মাড়ি এখন ফাঁকা-ফাঁকা, তার মুখ শ্রাবণ মাসের আকাশের মতো, স্লেটের মতোও বলা চলে। কেমন ফোলা-ফোলা, কালো-কালো, ভার-ভাব।

আজও মনে হয়, সেই খেজুরগাছ মাথা নেড়ে নেড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "কী খবর? ভালো আছ তো?" এর কী জবাব দেব, ভেবে পাই না। শুধু চেয়ে থাকি। হঠাৎ কাদের গলার আওয়াজ বেজে ওঠে, শুনতে পাই। ভারি চেনা-চেনা লাগছে তো! আরে, ওরা যে ভিক্টোরিয়া পার্কের সেই গাছগুলো যারা সুন্দর ছায়া বিছিয়ে দিত দুপুরে, বিকেলে। ওরাও আমাকে জিজ্ঞেস করছে, "কী খবর? ভালো আছ তো? মনে পড়ে আমাদের কথা?" কী করে ভুলব তোমাদের? সেই কবে আদর করে ছায়া মেখে দিয়েছ আমার গায়ে, সেকথা ভুলব কেমন ক'রে? কতদিন তোমাদের কাছে গেছি, পা ছড়িয়ে বসেছি ভিকটোরিয়া পার্কের পুরু সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের ওপর। সেখানে বাদামের খোসা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিংবা এমনিতেই চুপ ক'রে ব'সে কাটিয়ে দিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ব'সে ব'সে দেখেছি গাছের পাতার ঝিলিমিলি, মানুষের নড়াচড়া। কোথায় ছিল সেই ভিক্টোরিয়া পার্ক? সদরঘাটের কাছেই। সদরঘাট পেরিয়ে, কিছু দোকানপাট ছাড়িয়ে গেলেই চোখে পড়ত সেই দেখতে প্রায় ডিমের মতো পার্কটি। গাছগাছালি-ভরা, লোহার রেলিং-ঘেরা। ভিক্টোরিয়া পার্কে যাওয়ার পথেই ছিল ছিমছাম একটা বইয়ের দোকান। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স। নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ছবিভরতি বার্ষিক 'শিশুসাথী' পাওয়া যেত সেখানে। আরও কত্ত বইপত্তর পাওয়া যেত, কে তার হিসেবে রাখত তখন!

সেই কবেকার পুরোনো এক বাড়ি। নাম তার আন্টাগড়। আর্মেনিয়ানদের ক্লাব ছিল ওটা। সেই এলাকায় তখন অনেক আর্মেনিয়ান ঘর বেঁধেছিল। পরে ইংরেজরা আর্মেনিয়ানদের কাছ থেকে সেই বাড়িটা কিনে নেয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পুরোনো আন্টাগড়ের ওপরই গড়ে ওঠে পার্ক। ইংরেজরা সাধ ক'রে তাদের দেশের রানির নামে নতুন নাম রাখল পুরোনো আন্টাগড়ের। তাই আন্টাগড় হ'ল ভিকটোরিয়া পার্ক। কেউ বলে ভিকটোরিয়া পার্ক, কেউ আবার আন্টাগড়ের ময়দান।

আর এই আন্টাগড়ের ময়দানে গাছের ডালে লটকিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় আমাদের দেশের অনেক বীর সিপাহিকে। তাঁরা মাথা তুলেছিলেন ইংরেজদের

বিরুদ্ধে। চির-উন্নত যাঁদের শির তাঁরা তো আর ইংরেজ শাসকদের চোখের মণি হ'তে পারেন না। তাই তাঁদের ঝুলতে হ'ল আন্টাগড়ের ময়দানে গাছের ডালে। সেটা কোন সাল? ১৮৫৭ সাল, সিপাহি বিপ্লবের কাল। গাছের ডালে লটকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হ'ল আমাদের দেশের বীরদের—আন্টাগড়ের ময়দান তার সাক্ষী। ভিকটোরিয়া পার্ক তার সাক্ষী।

দশ

কেমন উদাস-উদাস লাগে। সেখানে পা রাখলেই মাটি যেন কেঁদে ওঠে, ঘাস ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস। বাতাসও কান্নায় কেমন ভেজা-ভেজা। তখন আকশটাকেও মনে হয় খুব দুঃখি। মনে হয়, ঐ আকাশ কোনো বন্দিনী শাহজাদির ডাগর, নীল চোখ—যে চোখ ব্যথায় ছলছল করছে, যেন এক্ষুণি টলটলে জল গড়িয়ে পড়বে। সেখানকার মাটিতে কান্না, ঘাসে কান্না, বাতাসে কান্না, আকাশে কান্না। জড়ানো ছড়ানো। বিরাট ফটক, সুন্দর দেয়াল, মসজিদ, কবরের ওপর চোখ-জুড়ানো মকবরা। কতকালের পুরোনো, কিন্তু এখনও বেশ ঝকঝকে। মস্ত বড় পুকুরও রয়েছে একটা। পুকুরের ধার-ঘেঁষে জেগে রয়েছে ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের মতো ইটের ভাঙা-ভাঙা দেয়াল। কিন্তু এতকিছু থাকা সত্ত্বেও মনে হয়, সেখানে কছু নেই। খাঁখাঁ, ফাঁকা-ফাঁকা সবকিছু। একদিন অনেক কিছু ছিল। লোকলশকর, হাতি-ঘোড়া, শাহজাদা-শাহজাদি, বাঙলার সুবেদার। তাঁর শান-শওকত। তাঁর হাঁকডাক। কতকিছুই তো ছিল সেদিন। আজ তার কিছুই নেই বাকি। সব ফাঁকি। কোন জাদুর মায়ায় সব গেছে উড়ে ফুরফুরে হাওয়ায়। সত্যি কেউ উড়িয়ে নিয়ে গেছে সব। সময় তো মস্ত জাদুকর। এক নিমেষে, এক ফুঁয়ে সে সবকিছু নিয়ে যায় উড়িয়ে। তাই বাঙলার সেই সুবেদার নেই, শাহজাদা-শাহজাদি নেই, সুবেদারের লোকলশকর নেই, হাতিশালে হাতি নেই, ঘোড়াশালে নেই ঘোড়া।

আজ আর সেকালের বাঙলার সেই সুবেদার নেই, কিন্তু রয়ে গেছে কেল্লা। লালবাগের কেল্লা। সেকালের লোকলশকর নেই, সেপাই-সান্ত্রি নেই; কিন্তু লালবাগের কেল্লার ভেতরেই আছে একালের পুলিশ। আছে পুলিশের ফাঁড়ি। প্রথম যেদিন লালবাগের কেল্লার ভেতর পা রাখলাম, চোখ দিয়ে চাখলাম বিরাট ফটক, সুন্দর মকবরা, দুপুর-মেশা পুকুর আর লম্বা দেয়াল, নানা খেয়াল এসে ঘিরে ধরেছিল আমাকে। এই হাম্মামখানায় পানিতে পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসতেন সেকালের সুন্দরীরা। হয়তো পানি ছিটিয়ে দিতেন এ ওর গায়ে। পানিতে সরু, রাঙা আঙুল দিয়ে কী নকশা ফুটিয়ে তুলতেন ওঁরা আপনমনে? তাঁদের মনে কি কোনো দুঃখ ছিল? প্রথম যেদিন লালবাগের কেল্লার ভেতর পা রেখেছিলাম সেদিন

এরকম নানা কথা ভিড় জমিয়েছিল মনে। কেউ যেন আমাব কানে মন্ত্র প'ড়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে কেল্লার ভেতর আর আমি সেই মন্ত্রের মায়ায় ঘুরছি সেখানে।

কে বানিয়েছিলেন এই লালবাগের কেল্লা? ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর গোড়াপত্তন করেছিলেন শাহজাদা মোহম্মদ আজম। তখন তিনি ছিলেন বাঙলার সুবেদার। কেল্লার কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে চলে যেতে হ'ল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ডাকে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তখন লড়াই বেধেছে মারাঠাদের। তাই ডাক পড়ল শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের। শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের পর বাঙলার সুবেদার হলেন নবাব শায়েস্তা খান। সেকালের ঢাকার কাহিনী নবাব শায়েস্তা খানের কথা বাদ দিয়ে ভাবাই যায় না। লালবাগের কেল্লার কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন শায়েস্তা খান, কাজ শুরুও হয়েছিল। কাজ চলছে পুরোদমে, এমন সময় হঠাৎ একদিন মারা গেলেন শায়েস্তা খানের মেয়ে বিবি পরী। ইরান দুখ্‌ত—বিবি পরীর আরেক নাম, শায়েস্তা খান খুব ভালোবাসতেন বিবি পরীকে। দেখতে কেমন ছিলেন বিবি পরী? ডানাকাটা পরীর মতো হুবহু? নাকি পাষাণপুরীর সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার মতো যার শিয়রে জ্বলজ্বলে করে সোনার কাঠি, রুপার কাঠি। বিবি পরীও আজ ঘুমন্ত। সুন্দর মকবরার নিচে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। কোনো রাজকুমাবই সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙাতে পারবে না তাঁর। তাই তাঁর আর জাগা হবে না কোনোদিন।

রূপবতী, গুণবতী—দুইই ছিলেন বিবি পরী। বাঙলার সুবেদারের বিশাল বুক উজাড় করে তিনি একদিন চ'লে গেলেন মৃত্যুর আঁধারপুরীতে। জখমের সঙ্গে পরিচয় কম ছিল না শায়েস্তা খানের; কারণ বহুবার লড়তে হয়েছে তাঁকে। যুদ্ধের ময়দানে ভরা-দুপুরের রোদ্দুরের মতো কতবার ঝলসে উঠেছে তাঁর তলোয়ার। অনেককে জখম করেছেন, নিজেও জখমি হয়েছেন। সে-জখমের জ্বালা ভোলা যায়, কিন্তু কী করে তিনি ভুলবেন এই জখমের কষ্ট? মেয়ের মৃত্যুতে ভারি শোক পেলেন শায়েস্তা খান। কারিগরদের বারণ করে দেয়া হ'ল যাতে তারা আর কেল্লার কাজে হাত না দেয়। লালবাগের কেল্লা বানানোর কাজ অলক্ষুণে মনে হ'ল বাঙলার সুবেদারের কাছে। তার বদলে বড় যত্ন করে বানানো হ'ল এক মকবরা, বিবি পরীর কবরের ওপর। মকবরা তৈরির জন্যে উত্তর ভারত থেকে আনানো হ'ল নানা মালমশলা। চুনার থেকে এল বেলেপাথর আর জয়পুর থেকে শ্বেত মর্মর।

ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম সেই কবেকার লালবাগের কেল্লা। তার আগের কেল্লা নেই, তবু যেন কী একটা আছে যা মনকে টানে খুব। ঢাকাই মসলিনের মতো

মিহি একটা উড়নি কে যেন বিছিয়ে দেয় মনের ওপর, কেউ যেন রূপকথার ফোয়ারার মতো সুরে শোনায় ঘুমপাড়ানিয়া গান। চোখ বুজে আসে। ইচ্ছে হয় ঘুমিয়ে পড়ি ঐ পুকুরের বাঁধানো ছাদঅলা শান্ত, নিঝুম ঘাটে। পুরোনো কালের পুরোনো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ছুঁয়ে যাবে আমাকে, আমি ঘুমিয়ে পড়ব, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখব। দেখব, ঐ চলেছেন বাঙলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান। এক গভীর চিন্তার ছায়া তাঁর মুখে। আর ঐ তো তাঁর সহেলিদের সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিবি পরী। বিকেলবেলার হাওয়া এসে চমৎকার খেলা জুড়ে দিয়েছে তাঁর রেশমি চুলের সঙ্গে। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসবে তেজি ঘোড়ার আওয়াজ। মোগল আমলের ঘোড়ার আওয়াজ ভেসে না এলেও কানে আসে ঢাকার হাল আমলের ঘোড়ার গাড়ির ঝকর ঝকর শব্দ। রাস্তায় ঘোড়ার খুরের ঠক ঠক শব্দ, চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ। ধুলো উড়ছে। ধুলো উড়েছিল সেদিনও, যেদিন ঢাকা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন বাঙলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান। সেদিন তাঁর শরীরে বয়সের ভার, চোখেমুখে নানা স্মৃতির উঁকিঝুঁকি। তাঁর চোখ দুটো হয়তো নিমেষের জন্যে ছলছল করে উঠেছিল সেদিন, যেদিন চিরতরে ঢাকা ছেড়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকা শহরের সবাই ছুটে এসেছিল শায়েস্তা খানকে বিদায় জানানোর জন্যে। লোকের ভিড়ে পথ গমগমে, শহরের পশ্চিম-ফটকের কাছে এসে থামলেন নবাব শায়েস্তা খান। শহরবাসীরাও থামল সেখানে। শায়েস্তা খানের শাসন আমলে বাংলাদেশ ছিল সত্যিকারের সোনার বাঙলা। সোনার ফসল উপচে পড়ত সারা দেশে। গোলায়-গোলায় ধান, গাছে-গাছে ফল, পুকুরে-দিঘিতে মাছ। অনেক, অজস্র। সুদিন তখন বাংলাদেশের সবসময়ের সাথি। ঢাকা শহরেও তখন সুদিনের ঝিলিমিলি। বারো মাসে তেরো পার্বণ। ধন্য রাজ্য, পুণ্য দেশ। চাল-ডালের অভাব নেই। এক টাকায় আট মণ চাল যায় কেনা। মণপ্রতি দু'আনা দাম চালের। যত পার পেট পুরে খাও। অন্ন, পায়েস, পিঠে—যা ইচ্ছে খাও, খাওয়াও। ঘরে অতিথি এলে বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই। হাঁড়িভরা ভাত। পাতভরা তরকারি, মাছ। তখন ঢাকা শহরের দোরে-দোরে হাতি বাঁধা।

সেই সুদিনের স্মৃতি ধরে রাখার জন্যেই বাঙলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান তৈরি করিয়েছিলেন ঢাকার পশ্চিম-ফটক। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় এই ফটকের সামনে এসে থামলেন তিনি। ভালো করে দেখলেন ফটকটাকে, তারপর কী মনে হ'ল তাঁর, বললেন, তাঁর যাওয়ার পর এই পশ্চিম-ফটক যেন বন্ধ ক'রে দেয়া হয়। তাঁর আদেশেই ফটকের গায়ে লেখা হয়, "ভবিষ্যতে যদি কোনো শাসনকর্তা বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের মতো শস্যের দাম কমাতে পারেন তবেই তিনি এই ফটকটি খুলতে পারবেন।" এই নির্দেশ রেখে পশ্চিম-ফটকের ভেতর দিয়েই ঢাকা থেকে বেরিয়ে গেলেন বাঙলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান।

দিনের পর দিন যায়, পশ্চিম-ফটক আর খোলা হয় না! কার সাধ্যি খোলে সেই ফটক? আগে শস্যের দাম কমাও, এমন ব্যবস্থা করো যাতে লোকজন টাকায় আট মণ চাল কিনতে পারবে, তারপর খোলো পশ্চিম-ফটক। শস্যের দাম না কমিয়ে ফটক খুলতে গেলে সর্বনাশ হবে, অভিশপ্ত হবে তুমি। শস্যের দামও কমে না, ফটকও খোলে না। অনেক অনেক দিন পর নবাব সরফরাজ খানের শাসন আমলে আবার শস্যের দাম কমল। তাঁর দেওয়ান যশোবন্ত রায় ঘটা ক'রে খোলালেন সেই কবেকার বন্ধ-করা পশ্চিম-ফটক। আবার এক টাকায় আট মণ চাল, নইলে ফটক খোলাই হ'ত না কোনোদিন।

টাকায় আট মণ না হ'লেও পাঁচ টাকায় এক মণ চাল আমরাও খেয়েছি। ভালো সরু চাল। রেশনের কুৎসিত, কাঁকরময় চাল নয়। সেই চাল সেদ্ধ করলে জুঁইফুলের মতো ভাতে ভ'রে উঠত হাঁড়ি। মোটা নয় মোটে, বিচ্ছিরি গন্ধও নেই তাতে। আস্তে-আস্তে বেড়ে চলল চালের দাম আমার বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। একদিন ঠেকল এসে আশি টাকা মণে। গুনে পুরো আশিটা টাকা দাও দোকানির হাতে তারপর পাবে এক মণ চাল! চাল সরস কি নীরস তা নিয়ে কোনো কথা বলা যাবে না। বাজারেরও যে একটা রঙ আছে এবং সে-রঙ কালো তা সেবারই জানতে পারলাম প্রথম। লোকের মুখে-মুখে কালোবাজারের জিকির আর মাথায়-মাথায় দু'মুঠো চাল জুটোবার ফিকির। আশি টাকা মণ দামে চাল কিনে খাওয়ার মতো সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে ক'জন? তাই অনেকের উনুনে চড়ে না হাঁড়ি। অনেকে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে থাকে, দু'বেলা -রা খেতে পায় তাদের সংখ্যা এত কম যে দু'হাতের আঙুলেই গুনে শেষ করা যায়। ধনীদের কথা বাদ দেয়া যাক; কী সুদিন, কী দুর্দিন—সব দিনেই ওদের দস্তরখানে থরেথরে বিচিত্র সব খাবার সাজানো। চোখ-ঝলসানো রং, জিভে জল-জাগানো ঘ্রাণ। দু'মুঠো চাল জোটানোর জন্যে ওদের ছুটতে হয় না দোকানে-দোকানে। কাঁড়িকাঁড়ি টাকা আর তাল তাল সোনা জমানোর ফিকিরেই তাঁরা ঘোরেন। ঘোরেন, মানে মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে যান এক দালান থেকে আরেক দালানে। কত শলা, কত পরামর্শ, কত মাথা-নাড়ানাড়ি, কত ফিসফিসানি, ব্যাংকের খাতায় কত খসখসে সই, কত লাঞ্চ, কত ডিনার। সবকিছুই বেশুমার। তাই চালের দাম আট টাকা মণ হলেও কী, আশি টাকা হলেও কী—এতে তাঁদের কিছু এসে যায় না। যাদের এসে যায় তারা উপোস করে, না-খেয়ে মরে। তাদের শরীর নিয়ে টানাটানি করে শেয়াল-কুকুর।

মানুষের শরীর নিয়ে টানাটানি করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল উনিশশো তেতাল্লিশের শেয়াল-কুকুরের পাল। আর শকুনের দল। ওদের নখ আর ঠোঁটে

কেমন মানুষ-মানুষ গন্ধ ভুরভুর করত তখন। উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। হাড়গোড় বেরিয়ে-পড়া বছর। কঙ্কাল-বছর। বাংলাদেশের উপোসি মুখের দিকে তাকানো যায় না আর। মুখ তো নয়, যেন মড়ার খুলি! গায়ের তাল তাল মাংস খুবলে খাচ্ছে পশুর পাল।

ওরা কারা চলাফেরা করছে ঢাকার পথে-পথে? কোত্থেকে এসেছে তারা? ওরা কি মানুষ? হয়তো মানুষ ছিল একদিন, আজ মানুষ ব'লে চেনা মুশকিল। ওরা তো চলন্ত কঙ্কাল একেক জন। কী খুঁজছে ওরা? একমুঠো ভাত? হাভাতে আর হাভাতিদের আজ ভাত দেবে কে? সবার পাতই আজ খালি মাঠের মতো খাঁখাঁ করছে। পুরুষেরা সারাদিন ঘুরেও একমুঠো চাল জুটোতে পারে না, মেয়েরা ঘর থেকে বেরুতে পারে না কাপড় নেই ব'লে। ডাস্টবিনের ফেলে-দেয়া ঝুটো-কাঁটা নিয়ে মানুষ আর কুকুরে কাড়াকাড়ি। পথের ধারে মরা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে শিশু। ভাত পেল না, রুটি পেল না, ফ্যান খেল, গাছের পাতা খেল। তবু গেল না প্রাণ বাঁচানো। আজও কানে বাজে, 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও।' সারা ঢাকা শহর যেন মুহূর্তে চিৎকার করে উঠছিল 'ফ্যান দাও, ফ্যান দাও' ব'লে।

শিউরে উঠেছিলাম। শিউরে উঠেছিলাম আমি, আমবা। আব্বা কেমন চুপচাপ। আম্মার মুখে হাসি নেই আগের মতো। বেশ টের পাই, আব্বার রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে সংসার চালাতে। কিছুতেই কুলোতে চায় না! অভাব তার মস্ত হাঁ-করা মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে। অনটন যেন পেয়ে বসেছে আমাদের। একবেলা ভাত খাই, আরেক বেলা আটার রুটি। আটার রুটি খেতে একটুকুও ভালো লাগে না। তবুও খেতে হয়। একদিন আব্বা আমাকে পাঠালেন মুদির দোকান থেকে ধারে সওদা আনার জন্যে। গেলাম, কিন্তু একটু পরেই ফিরে আসতে হ'ল মুদির দাঁত-খিঁচুনি ও মুখ-খিঁচুনি দেখে। আগের মাসের বাকি শোধ না করলে সওদা দেবে না সে। সত্যি বলতে কি, সেদিন ভীষণ অসহায় মনে হয়েছিল নিজেকে। আব্বাকে মুদির ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল পানিতে। আব্বা যেন পাথরের মূর্তি। কিছুই বললেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন ওপরের দিকে। যেন মেঘের আনাগোনা দেখছেন আকাশে।

শিউরের উঠতে হয়েছে, অনেকবারই শিউরে উঠতে হয়েছে উনিশশো তেতাল্লিশে। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাত্তিরে। আজও সেই রাতের কথা ভুলতে পারিনি। রাত বেশি হয়নি তখন, বৈঠকখানায় খেতে বসেছি। পাতে আটার রুটি অর আলুভাজা। মুখে এক টুকরো রুটি পুরতে যাব এমন সময় শিউরে উঠলাম। ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। জানালায় একজোড়া চোখ আর কী দৃষ্টি সেই চোখে! রাজ্যির ক্ষুধা এসে যেন জড়ো হয়েছে সেই একজোড়া

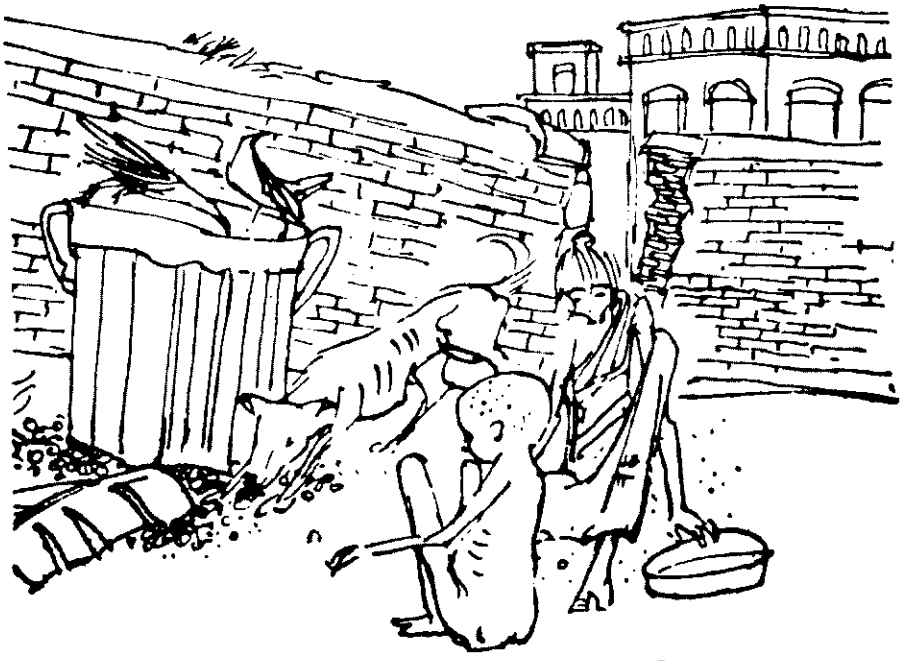

ডাস্টবিনের ফেলে-দেয়া ঝুটো-কাঁটা নিয়ে মানুষ আর কুকুরে কাড়াকাড়ি।

চোখের ভেতর। মুখে একরত্তি মাংসের চিহ্ন নেই, হাড় আর চামড়া একাকার হয়ে গেছে। জানালার ওপার থেকে একটা গোঙানি ভেসে এল। এতবার সেই গোঙানি শুনেছি যে তার অর্থ বুঝতে একটুকুও কষ্ট হ'ল না আমার। তারপর কী ঘটল কিছুই মনে করতে পারলাম না। দেখলাম, আমার বাসন খালি; রুটি কিংবা আলুভাজা কিছুই নেই, জানালার ওপারেও নেই সেই একজোড়া চোখ। না, কেউ কেড়ে নেয়নি আমার খাবার। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ ছিল। আবার গেলাম আম্মার কাছে। আমাকে রুটি চাইতে দেখে খুশিই হলেন তিনি। হয়তো ভাবলেন, তাঁর ছেলে আটার রুটির ভক্ত হয়ে পড়ছে দিনদিন। মা জানলেন না সেই সন্ধ্যার একজোড়া চোখ, একটা গোঙানি আর দুটো রুটির ইতিহাস। আটার রুটি দেখলেই আমার সেই ভুতুড়ে সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে যায়। আমার সামনে ভেসে ওঠে একজোড়া চোখ, যে-চোখে জ্বলে উঠেছিল সারা বাংলাদেশের ক্ষুধা।

উনিশশো একচল্লিশে লড়াই বাধল ইউরোপে আর সেজন্যে খেসারত দিতে হ'ল সারা পৃথিবীকে, আমাদের বাংলাদেশকেও। বেজেছে দামামা, বাঁধরে আমামা। কিন্তু আমামা লুটোয় ধুলোয়। মাছির মতো মরে মানুষ। কেউ বন্দুকের

গুলিতে, কেউ কামানের গোলায়, কেউ বোমার ঘায়ে। ইউরোপে ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর, সেই শব্দে কেঁপে ওঠে সুদূর বাংলাদেশের কত ঘর। ট্যাঙ্ক চলছে তো চলছেই, বোমা পড়ছে তো পড়ছেই। হাজার হাজার ঘর ভাঙছে, বাড়ি ভাঙছে। পুল ভাঙছে, ইশকুল ভাঙছে। দরদালান সব ভাঙছে। গির্জে, হাসপাতাল—তাও ধসে যাচ্ছে তাসের বাড়ির মতো। সারা ইউরোপে ঘরহারাদের ভিড়। হিটলারের দাপটে পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেউ। টিকে থাকাই দায়। মানুষ মারার কলের অভাব নেই। যেদিকে যাও মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে, বোমায় মরনি, যাও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, যাও গ্যাস চেম্বারে। সেখান থেকে রেহাই পাবে না কিছুতেই। কত লোক মরল তার কোনো লেখাজোখা নেই।

লোকের মুখে লড়াই ছাড়া কথা নেই। খেতে লড়াই, বসতে লড়াই, শুতে লড়াই। লড়াই আর লড়াই। খবরের কাগজে বড় বড় হেডিং। ক'টা জাহাজ ডুবল, ক'টা শহর পুড়ল, ক'টা বোমারু বিমান পড়ল, কত সৈন্য মরল, তারই হিসেব কাগজের পাতা জুড়ে। লোকের মুখে-মুখে ঘুরেফিরে আসে কয়েকটি নাম। জার্মানি, জাপান, ইতালি, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, আমেরিকা। স্টালিন, চার্চিল, হিটলার, মুসোলিনি। হিটলারের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল সারা পৃথিবী। জার্মানির

এমন সময়ে শিউরে উঠলাম

অনেক জানীগুণীকেও স্বদেশ ছেড়ে আসতে হ'ল। কারণ হিটলারের তাঁবেদারি করতে পারেননি। জার্মানির রাস্তায়-রাস্তায় পোড়ানো হ'ল তাঁদের বইপত্তর। কিন্তু সেইসঙ্গে পুড়তে হ'ল গোটা জার্মানিকেও। শেষ পর্যন্ত হিটলারের দর্প গেল গুঁড়িয়ে। যুদ্ধে জার্মানির চরম পরাজয় ঘটল। সেই সর্বনাশা যুদ্ধ অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে হিটলারকেও গিলে ফেলল। জাপানকে দমানোর জন্যে আমেরিকা অ্যাটমবোমা ফেলল হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে। সেখানে উঠল আরেক হাহাকার। অ্যাটমবোমার ভয়ানক রূপ দেখে শিউরে উঠল গোটা মানবজাতি। কী মারাত্মক এই অস্ত্র! তবে কি মানবজাতির দিন ঘনিয়ে এল পৃথিবীতে? প্রশ্ন জাগল অনেকের মনে। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের মনেও সেই একই প্রশ্ন। মানুষের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝেসুঝে না চললে পৃথিবীতে মানুষের চিহ্নটুকু থাকবে না—রাসেল খোলাখুলি জানিয়ে দিলেন সবাইকে। কিন্তু কেউ কি কান দেবে তাঁর কথায়?

বারো

যে-দুর্ভিক্ষ নিজের চোখে দেখেছি তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে হ'ল একদিন। তখন আমি ম্যাট্রিকে পড়ি। টেস্ট পরীক্ষা। ইংরেজি প্রশ্নপত্রে তিন-চারটে বিষয়ের উল্লেখ ক'রে বলা হ'ল তার মধ্যে যে-কোনো একটি বিষয় বেছে নিয়ে প্রবন্ধ লেখার জন্যে। একটি বিষয় ছিল দুর্ভিক্ষ। আমি দুর্ভিক্ষকেই বেছে নিলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল আকাশের নানা ছবি—টুকরো-টুকরো, ছেঁড়া-ছেঁড়া। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। বুক দুরুদুরু করছিল। আমার বুকের ভেতর বড় একটা ঘড়ি যেন খুব জোরে বেজে চলেছে। টিক, টিক, টিক। সময়ও জোরে ছুটে যাচ্ছে তেজি ঘোড়ার মতো কোন দূর তেপান্তরে। বুক দুরুদুরু আমার। তখনও খাতায় লেখা শুরু করতে পারিনি। প্রথমেই প্রবন্ধটা লিখব ভেবেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। তাই বাকি সব প্রশ্নের উত্তর লিখে প্রবন্ধটি শুরু করলাম সবশেষে। আবার চোখের সামনে ছবির মিছিল। আকালের ছবি। আকালের কঙ্কাল। ভুখা মানুষের মুখ। হঠাৎ শুনতে পেলাম একটা গোঙানি। দুটো চোখ আমার সামনে জেগে উঠল। চোখ দুটো কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে আমার ডেস্কের ওপর। সেই দুটো চোখে ক্ষুধার ভয়ানক নোটিস। সে-নোটিসের ভাষা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না।

একবার ভাবলাম, না থাক, দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে কাজ নেই। অন্য একটা বিষয় বেছে নিই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধ লিখতে হ'ল দুর্ভিক্ষেরই ওপর। মনে হ'ল, দুর্ভিক্ষ নিয়ে প্রবন্ধ না লিখলে ঐ দুটো চোখ আমার ডেস্ক ছেড়ে

কিছুতেই যাবে না। প্রথম বাক্যটি রচনা করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেলাম। কিন্তু প্রথম বাক্যের হার্ডল পেরুনোর পর কলম তরতর করে এগিয়ে গেল।

ইংরেজি, বাংলা আর অঙ্ক পরীক্ষা দেয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ভীষণ জ্বর। বাকি পরীক্ষা আর দেয়া হ'ল না। টেস্ট পরীক্ষা। মাত্তর তিনটে বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছি। অ্যালাউড হব তো? পরীক্ষার ফল বেরুনোর দিনে গেলাম ইশকুলে। মন-খারাপ। শরীর খারাপ। বুক দুরুদুরু। কী জানি কী হয়! একসময় হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে ডাক পড়ল। আমি ভয়ে জড়োসড়ো। চেয়ারে ব'সে আছেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য। আমাদের হেডমাস্টার। রাশভারী মানুষ। চোখে চশমা, গায়ে গলাবন্ধ কোট আর ধুতি। তাঁর হাতে একটা খাতা। খাতাটা নেড়েচেড়ে তিনি বললেন, "দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে-প্রবন্ধটা লিখেছ সেটি খুব ভালো হয়েছে।"

খুশিতে আমি আতশবাজি হয়ে গেলাম। তা হ'লে নিশ্চয়ই অ্যালাউড। হ'লও তা-ই। ইংরেজি ও বাংলায় ভালো নম্বর পেলাম। অঙ্কে তেমন সুবিধে হ'ল না। তবু অ্যালাউড। ইচ্ছে হ'ল, এক দৌড়ে ইশকুলেব মাঠের এপার থেকে ওপারে ছুটে যাই। দারোয়ানেব ঝোপের মতো গোঁফকেও আর বিচ্ছিরি মনে হ'ল না সেদিন। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে চলল খুশির ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ মাতামাতি। সবকিছু মাত করে ফেলার ভাবটা একসময় ঝিমিয়ে এল। আবার মন-খারাপ। কেমন উদাস-উদাস। আমার বুক পোগোজ ইশকুলের মাঠ। আমার বুক ক্লাস টেন-এর শূন্য ঘর। আর কোনোদিন এসে বসব না এই ঘরে। আর কোনোদিন গোল্লাছুট কিংবা চোর-পুলিশ খেলব না পোগোজ ইশকুলের মাঠে। সূর্যকিশোর, আবু তাহের, বিমল, সুবিমল, নীহার, নিরঞ্জন, আশরাফ, শাজাহান, সুজা— এদের সঙ্গে যদি আর দেখা না হয় কোনোদিন?

ইংরেজি পরীক্ষায় ভালো করেছিলাম ব'লে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন চিন্তাহরণবাবু। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ সোম। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। চুপচাপ, নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করতেন চিন্তাহরণবাবু। ইংরেজি ব্যাকরণ এমন চমৎকার পড়াতেন যে ব্যাকরণ শিখতে আমাদের চোখের পানি ফেলতে হ'ত না। ভারি মজা পেতাম। কটমট, খটখট কিছুই মনে হ'ত না ব্যাকরণকে। 'ব্যাকরণ মানি না', একথা বলতে ইচ্ছে করত না, যখন চিন্তাহরণবাবু হাতে তুলে নিতেন নেস্‌ফিল্ডের গ্রামার। আমার সৌভাগ্য, চিন্তাহরণবাবুর প্রচুর স্নেহ পেয়েছিলাম আমি। ক্লাসের ছেলেরা আমাকে চিন্তহরণবাবুর 'জামাই' বলে খ্যাপাত। ক্লাসে তিনি আমার খোলাখুলি প্রশংসা করতেন বলেই আমার ঐ উপাধি জুটেছিল। শিক্ষকদের ঘরের এক কোণে একটা বাক্স ছিল, তার ওপরই বসতেন চিন্তাহরণবাবু।

চেয়ারে বসে আছেন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য

একা। অন্যান্য শিক্ষক গল্পগুজব করতেন, হাসি-তামাশা করতেন চেয়ারে ঠেস দিয়ে। কিন্তু চিন্তাহরণবাবু ঐ বাক্সটার ওপর ব'সে ব'সেই সময় কাটিয়ে দিতেন। কোনোদিন হাতে বই, চশমা-আঁটা চোখ দুটো বইয়ের পাতায় লাইন থেকে লাইনে ঘুরে-বেড়ানো। কোনোদিন, কিছু না-করা, পা-দোলানো, বাক্সের ওপর এমনি ব'সে থাকা, সামনের দিকে দৃষ্টি ছড়ানো। কোনো-কোনোদিন টিফিনের সময় যেতাম সেই কাঠের বাক্সটার কাছে, মানে চিন্তাহরণবাবুর কাছে। তিনি খুশি হতেন। অনেক কথা বলতেন। বলতেন পড়াশুনো করার জন্যে, ভালো হয়ে চলার জন্যে। বলতেন, মানুষ হওয়ার চেষ্ট করো। একদিন বললেন, "শুধু লায়েক হ'লে চলবে না, লিয়াকত হাসিল করা চাই। সবাই লায়েক হয়, কিন্তু লিয়াকত হাসিল করতে পারে গুটিক'জন মানুষ।" আমি চুপ করে রইলাম। চিন্তাহরণবাবু বুঝলেন যে আমি তাঁর কথা কিছুই বুঝিনি। লিয়াকত কথার মানেই জানি না, তাই বোঝা মুশকিল বইকী! তিনি লায়েক ও লিয়াকতের মানে বেশ সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, বয়স সবারই বাড়ে, কিন্তু নিজেকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে

খুব কম লোকই! ভারি ভালো লাগত চিন্তহরণবাবুর কথা শুনতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতাম অনেকক্ষণ। ঘণ্টা বেজে উঠলে বলতেন, "এবার ক্লাস করো গে যাও।" চিন্তাহরণবাবুর কথা যেন গ্রীষ্মকালের ঝাঁঝাঁ দুপুরে ঠাণ্ডা শরবত। মন-জুড়ানো, প্রাণ-জুড়ানো। সেসব কথার কোনোদিন পুরোনো হওয়ার কিংবা ফুরোনোর নাম নেই। আজও হঠাৎ মনে পড়ে, "শুধু লায়েক হলে চলবে না, লিয়াকত হাসিল করা চাই।"

ইশকুলে আরও একটি প্রবন্ধ লিখে প্রশংসা পেয়েছিলাম। ক্লাস নাইন-এর অ্যানুয়েল পরীক্ষায় বাংলায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বিষয় ছিল "এক টুকরো কয়লার আত্মকাহিনী"। নিজেকে এক টুকরো কয়লা কল্পনা করে বেশ মজা পেয়েছিলাম সেদিন। ক্লাস নাইন-এ আমাদের বাংলা পড়াতেন শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গুলী। বাংলা সেকেন্ড পেপারে আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল দু'জন, কিন্তু প্রবন্ধে আমার নম্বর উঠেছিল সবচেয়ে বেশি। বিনয়বাবু প্রবন্ধটির কথা ক্লাসের সবাইকে বললেন। প্রবন্ধটি প'ড়ে শোনালেন সবাইকে।

হাতে এলো বার্ষিক 'শিশু সাথী'

বিনয়বাবু বড় বেশি পান খেতেন। তাঁর মুখে অষ্টপ্রহর পান থাকত, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। অত বেশি পান চিবোনোর জন্যে কি না জানি না, বিনয়বাবুর কথাবার্তা ছিল ভারি রসালো। যদিও চুলে তাঁর পাক ধরেছিল, প্রাণে পাক ধরেনি মোটেই। সবসময় হাসিখুশি। তিনি হাত তুলতেন না কারুর ওপর, বকাবকিও করতেন না। তবে কালেভদ্রে রেগে উঠলে এমন একটি কি দু'টি কথা বলতেন আস্তে-আস্তে যে, তখন নিজেদের মস্ত অপরাধী মনে হ'ত আমাদের। তাঁর ক্লাসে দুষ্টুমি করার উপায় ছিল না। বেতের ভয়ে নয়। তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে পড়াতে পারতেন বলেই আমরা কখনো অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেতাম না। মাঝে-মাঝে রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প শোনাতেন তিনি। মনকেড়ে-নেয়া সব গল্প।

বিনয়বাবুর হাতে একদিন একটা রংচঙে বই দেখলাম। বার্ষিক 'শিশুসাথী'। 'শিশুসাথী' হাতে নেয়ার জন্যে রীতিমতো লোভী হয়ে উঠলাম। ওটা বিনয়বাবুর কাছ থেকে চেয়ে নেব কি নেব না, এই ভাবনাতেই কেটে গেল অনেকক্ষণ। চাওয়া আর হ'ল না শেষ পর্যন্ত। বিনয়বাবু জানতেও পাবলেন না, তাঁর এক ছাত্র ঐ রঙিন মলাটঅলা বইটা পাওয়ার জন্যে কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। জানলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর ছাত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করতেন। হঠাৎ কোথাকার এক লজ্জা এসে আমার মুখে খিল এঁটে দিল। টেবিলের ওপব বার্ষিক 'শিশুসাথী'। আমি শুধু চোখ দিয়ে চাখলাম।

একদিন সত্যি সত্যি হাতে এল বার্ষিক 'শিশুসাথী'। বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্সে গিয়েছিলাম একটা পাঠ্যপুস্তক কেনার জন্যে। হঠাৎ চোখ পড়ল রংচঙে একটা বইয়ের দিকে, দেখেই মনে হ'ল, চিনি। কলজে লাফিয়ে উঠল, যেমন একটা মাছ লাফিয়ে ওঠে রোদ্দুর-লাগা জল-টুসটুস দিঘিতে। চেনার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল কেনা। পাঠ্যবই আর সেদিন কেনা হ'ল না। বার্ষিক 'শিশুসাথী'কে সঙ্গী করেই ফিরে এলাম বাড়িতে। কাপড়চোপড় না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে পড়া, কাগজেব মোড়ক খুলে শুয়ে-শুয়ে 'শিশুসাথী' পড়া। কী কী পড়েছিলাম সেই 'শিশুসাথী'তে আজ তাব কিছুই মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একটা ঘোড়ার গল্প। তা-ও বড় বেশি ধোঁয়াটে। আর মনে পড়ে সেই ঘোড়া আর এক ঘোড়সওয়ারের ছবি।

শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গুলী ছিলেন 'শিশুসাথীর' নিয়মিত লেখক। তাছাড়া তিনি 'শিশুসাথী'র সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর লেখা গল্পগুলোতে পড়ত ইতিহাসের ছায়া। ছোটদের মনের মতো ক'রে গল্প বানাতেন তিনি। বিনয়বাবু ছিলেন আমার দেখা লেখক দ্বিতীয়, আমার দেখা প্রথম লেখকের কথা পরে বলছি। কিন্তু আমার মনে তাঁর স্মৃতি লেখকের চেয়ে শিক্ষক হিসেবেই বেশি ঝলমলে। সত্যি কথা বলতে কি, লেখকদের মহিমা বোঝার বয়স তখনও আমার

হয়নি। তখন হয়তো মাথায় অত বুদ্ধিই গজায়নি যা দিয়ে বোঝা যায় লেখকদের মাহাত্ম্য।

আমার দেখা প্রথম লেখক জনাব আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। তাঁকে যখন দেখেছি তখন আমি খুবই ছোট। আমাদের বৈঠকখানায় প্রায় রোজই দেখা যেত আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নকে। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। খুব বেশি শুকনো মনে হ'ত তাঁকে। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুল। দু'ভাগ করে আঁচড়ানো। পরতেন শাদা প্যান্ট, কালো রঙের কোট আর শাদা ক্যাম্বিসের জুতো। কষে হুঁকো টানতে দেখেছি আমাদের বৈঠকখানায়, আব্বার সঙ্গে তাঁর খুবই বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের বাড়িতে একটা পুরোনো ফটোগ্রাফ আছে। ফটোগ্রাফটিতে সেই কবে থেকে ব'সে রয়েছেন তিনজন। আব্বা, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন ও আরও একজন। আব্বার মুখে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুটির কথা প্রায়ই শোনা যেত। দিলদরিয়া মানুষ। চালচুলোর ঠিকঠিকানা নেই। সাহিত্যের সমুদ্দুরে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছেন। জীবন টিকিয়ে রাখার জন্যে যে-রসদটুকু দরকার তা শুধুই ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। সেই আপনমনে ভেসে চলেছেন তো চলেছেনই।

বাবুর বাজারের পুলের সামনেই ছিল তাঁর আস্তানা। একটা ছোটখাটো প্রেস করেছিলেন। কী নাম ছিল প্রেসটার? কিছুতেই মনে পড়ছে না। ওখানেই পায়রার খোপের মতো একটা ঘরে ঝুঁকে ঝুঁকে লিখতেন কিংবা হুঁকোর ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতেন হাওয়ায়-হাওয়ায়। একদিন যাচ্ছিলাম সেই প্রেসের ধার-ঘেঁষে। দেখেছি হাত নেড়ে ডাকলেন। বসতে বললেন। হুঁকা টানার ফাঁকে-ফাঁকে বললেন কিছু কথা। সেসব কথা আজ বড় আবছা কেমন মেঘলা-মেঘলা। তখন খুবই ছোট ছিলাম। বহুকাল পর সলিমুল্লা মুসলিম হলের ম্যাগাজিনে তাঁর একটি কি দু'টি লেখা পড়েছিলাম। ভাষার ওপর তাঁর বেশ দখল ছিল, বোঝা যায়। তাঁর একটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছিল। গুণী ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নেই। কাজী নজরুল ইসলাম 'কাব্যে আমপারা' ও 'রুবাইয়াৎ-এ-ওমর খৈয়াম'-এর ভূমিকায় আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। বলেছেন, তিনি ঐ দুটো বই তর্জমা করার সময় অনেক সাহায্য পেয়েছেন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের কাছে।

আমার জন্মের কয়েক বছর আগে ঢাকায় শুরু হয় বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলন। মুসলমান সমাজের কয়েকজন সাহসী তরুণের উগ্যোগেই এই আন্দোলন শুরু হ'তে পেরেছিল। তাঁরা হলেন আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আনওয়ারুল কাদির, কবি আবদুল কাদির ও ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। আবুল হোসেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ক্যান্সার রোগ হওয়ায় অকালে মারা যান তিনি। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪২ বছর। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে

প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। এই সাহিত্যসমাজের পক্ষ থেকে 'শিখা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল। মাত্র পাঁচ-ছ'টি সংখ্যা বেরুনোর পরই 'শিখা'র আলো নিভে গেল। পত্রিকাটি নানা কারণে আর চালানো সম্ভব হ'ল না। মুসলমান সমাজের অন্ধকার দূর করার জন্যেই 'শিখা'র জন্ম হয়েছিল। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতারা মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছিলেন সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্যে। তাঁরা যাদের মনের চড়ায় বুদ্ধির মুক্তির ঢেউ বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওরাই খেপে উঠল। নানারকম ফন্দিফিকির আঁটল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার জন্যে। যারা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করল তাদের বুদ্ধি কিংবা যুক্তির জোর ছিল না। কিন্তু গায়ের জোর ছিল ষোলোআনাই। তাই ওরা সেদিন হাত তুলেছিল সাহিত্য সমাজের কোনো সদস্যের গায়ে।

আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন কি না জানি না, তবে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাদের কারও কারও সঙ্গে। কবি সমালোচক আবদুল কাদিরের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা ছিল। শুনেছি আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন 'শিখা'র একটি কি দুটি সংখ্যা সম্পাদনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন সম্পাদককে। মোট কথা, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন সাহিত্যচর্চাকেই জীবনে পরম সত্য ব'লে জেনেছিলেন। একটি উর্দু উপন্যাসের তর্জমা করেছিলেন তিনি। উপন্যাসটির নাম ছিল 'খুন না আঁসু'। তিনি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন 'রক্ত না অশ্রু'। ভাগ্যের কী পরিহাস, সত্যি সত্যি একদিন রক্ত উঠল তাঁর গলায়। রক্ত থুথুর সঙ্গে, রক্ত কফের সঙ্গে, কখনো কখনো শুধু রক্ত। পিকদান ঘনঘন টইটম্বুর হয়ে উঠত বুক-চেরা কলজে-ছেঁড়া রক্তে। তারপর একদিন সব শেষ। যক্ষ্মা রোগে অকালে মারা গেলেন আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন। সেই হাসিখুশি, দিলদরিয়া, আড্ডাপ্রিয়, সাহিত্যপিয়াসী মানুষটির চিহ্ন পর্যন্ত রইল না আর দুনিয়ায়।

আব্বা ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুটির মৃত্যুতে। কোনোদিনই তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্নের দুঃখ-কষ্টের পেরেক-বেঁধা জীবনস্মৃতি। বুঝি তাই যেদিন তিনি প্রথম আমার কবিতা লেখার খবর শুনলেন সেদিন তাঁর মুখ হয়ে উঠেছিল শ্রাবণের আকাশ—কালো মেঘে ঢাকা। সেই মেঘ কোনোদিন কেটেছিল বলে মনে পড়ে না। আর কেউ না বুঝুক, অন্তত আমি বুঝতে পারতাম আমার সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে কেন ভালো চোখে দেখতে পারেননি তিনি। এজন্যেই আমার মনে এ নিয়ে কোনো ক্ষোভ জাগেনি কোনোদিন।

তেরো

ঢাকা শহরের বুকে কেউ মস্ত এক ছোরা বসিয়ে দিয়েছে। শহরের কলজে থেকে রক্ত পড়ছে, রক্ত ঝরছে বৃষ্টির ফোঁটার মতো। এই বৃষ্টির ফোঁটার মতো রক্ত-ঝরে-পড়া একবার থামে আবার শুরু হয়। ভয়, একটা দারুণ ভয় কামড়ে ধরে সারাক্ষণ। ঘুরেফিরে শুধু সেই একই খবর। খুনখারাবির খবর। ধুতি পরে হেঁটে যাচ্ছে কেউ, দাও বসিয়ে ছোরা, বের করে ফ্যালো নাড়িভুঁড়ি। কেউ পাজামা কিংবা লুঙ্গি প'রে যাচ্ছে, আর রক্ষে নেই—মারো ছোরা, জন্মের মতো মিটিয়ে দাও হেঁটে যাওয়ার সাধ।

সারা ঢাকা শহরের বুকেই ভীষণ কালো, দৈত্য-দানোর দাঁতের মতোই ধারালো মস্ত ছোরা বসানো। সূর্য ওঠে অথচ কিছুতেই মনে হয় না যে সূর্য উঠেছে। দিনকে রাত ব'লে মনে হয়, এত অন্ধকার! ভয় সবসময়ের সাথি। ইশকুলে যাওয়া হয় না। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা নেই। মন-খারাপ। চারদিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর। প্রায় সবার কান হয়ে উঠেছে ডাস্টবিন—রাশি রাশি নোংরা খবরের জন্যে খাইখাই করছে সবসময়। মুসলমান শুনতে চায়, বেশকিছু হিন্দু সাফ হ'ল কি না, হিন্দু শুনতে চায়, বেশকিছু মুসলমান ম'ল কি না। মৃতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে সে কী প্রতিযোগিতা! ধুতি আর পাজামার সে কী লড়াই! ধুতি আর পাজামা লড়াই ক'রে মরছে, ব'সে ব'সে মজা দেখছে কোট-প্যান্ট। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার পেছনে যে ব্রিটিশের হাতসাফাই ছিল তা কেউ-কেউ টের পেলেও ওতে কোনো ফায়দা হয়নি। বন্ধ হয়নি হিন্দু-মুসলমানের একরঙা রক্তের স্রোত।

একসময় কমে আসত লুটতরাজ আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার দাপট। আবার সবকিছু ঠিকঠাক। ধুতির পাড়ায় পাজামা হাঁটছে, পাজামার পাড়ায় ধুতি। দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পর যখন আবার ইশকুলে যেতাম, তখন দু'একদিন কেমন যে বাধোবাধো ঠেকত। সহজ হতে পারতাম না। বড়দের মনের কালিমা ছোটদের মনেও ছড়িয়ে পড়ত ব'লে বাধত খিটিমিটি, বাধত ঝগড়া। নেড়ে আর মালাউনের ঠোকাঠুকিতে কথাবার্তা জমত না। জমত না খেলাধুলা। কিন্তু দু'একদিন যেতে-না-যেতেই আবার গলাগলি, আবার খেলা, আবার বিকেলবেলা ঘুরে বেড়ানো পল্টনের মাঠে, সদরঘাটে। আবার পল্টনের মাঠে ফুটবল খেলা দেখা, ঝালমুড়ি চিবোনো; আবার সদরঘাট হেঁটে বেড়ানো, মস্ত কামানের গায়ে হাত বুলানো। সদরঘাটে হাওয়া, খোলা হাওয়া। হাওয়ার দোলায় বুড়িগঙ্গা নদীর শিউরে-ওঠা। মাঝির বৈঠা চালানো দেখার খুশি নিয়ে বসা আহসান মঞ্জিলের দিকে পিঠ দিয়ে।

বুড়িগঙ্গা ব'য়ে চলেছে একটানা। বুড়িগঙ্গার ওপর নৌকো। বুড়িগঙ্গার ওপর গ্রীনবোট মানে বজরা। খোলা হাওয়ায় পালতোলা নৌকো চলেছে হাঁসের মতো পানি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো দাঁড়-বাওয়া মাঝির পেশি ওঠে ঝিকিয়ে বিকেলের রোদ লেগে। ব'য়ে চলে বুড়িগঙ্গার পানি। টলটলে জল। মাঝে-মাঝে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে পাড়ে। বুড়িগঙ্গার পানি জানে কত কাহিনী! সুখে ঝলমলানো, দুঃখে ছলছলানো। কত শাহি বজরা কত রণতরী ভিড়েছে বুড়িগঙ্গার তীরে। কত বিচিত্র মুখের মেলা সেখানে! কারও মুখ শরতের আকাশের মতো কারও-বা শ্রাবণের আকাশের মতো, কালো মেঘের বুনট-দেয়া। সেসব মুখ নেয়ে উঠেছে রোদে, জ্যোৎস্নায়। এই বুড়িগঙ্গার ওপর দিয়েই আলিবর্দি খাঁর কন্যা ঘসেটি বেগমকে নিয়ে যাওয়া হ'ল জিঞ্জিরা-প্রাসাদে। নির্বাসনে দুঃখের দিন কাটাতে শুরু করলেন ঘসেটি বেগম। বুড়িগঙ্গার টলমলে পানির দিকে চেয়ে কি সেদিন ছলছলিয়ে ওঠেনি ঘসেটি বেগমের চোখের পানি? বুড়িগঙ্গার পানিতে চোখের পানি ঝরিয়ে ঘসেটি বেগমের ছোট বোন আমিনা বেগমও একদিন এলেন জিঞ্জিরা-প্রাসাদে বন্দিনী হয়ে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্রবধূ। অল্প বয়সেই বিধবা। বুকে তাঁর সাত রাজার ধনের চেয়েও দামি ধন এক সন্তান। তাঁদের দুঃখের দিন আর কাটে না। মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই মিলল বটে, কিন্তু চোখে খুশির ঝিলিক নেই, ঠোঁটে হাসির ঝিকিমিকি নেই, বুকের ভেতর নেই সুখের ঝলক। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজনদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। তাঁদের দুঃখ দেখে বুড়িগঙ্গার পানিও বুঝি একটু বেশি ছলছলিয়ে ওঠে।

একদিন তঁদের জিঞ্জিরার প্রাসাদও ছাড়তে হ'ল। মীরজাফরের ছেলে মীরন। তাঁর নিষ্ঠুরতার সীমা নেই। মীরনের অত্যাচারে সবাই তটস্থ। কখন কার প্রাণ যায় এই ভয় সবার মনে। কারণ, সামান্য দোষেই মাথা পড়ে কাটা! মেয়েদের সুন্দর মেঘবরণ চুল-ভরা মাথাও বাদ পড়ে না। এই নিষ্ঠুর মীরনের হুকুমেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজনদের ডুবিয়ে মারা হ'ল বুড়িগঙ্গার বুকে। ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে বলা হ'ল যে, তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মিথ্যার ফাঁদে পা দিলেন তাঁরা।

১৭৬০ সাল। গোধূলিবেলায় আকাশ যেন টকটকে খুনি রঙের বেনারসি শাড়ি পরেছে। সেই রং এসে মিশেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে। জিঞ্জিরার ঘাটে বাঁধা এক নৌকো। দেখতে-দেখতে আকাশ তার শাড়ি পালটে ফেলল। টকটকে খুনি-রং বদলে গেল কালো রঙে। দুঃখের রং শোকের রং। বুড়িগঙ্গার চোখ কাঁপে বুক ছলছলায় বুক চিরে বেরোয় দীর্ঘশ্বাস। হুহু হাওয়ায় দুলে ওঠে নৌকো। সেই নৌকোয় এসে উঠলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার আপনজন। নৌকো চলল ঘাট

ছেড়ে। নৌকো চলল বুড়িগঙ্গার সন্ধ্যা-মাখানো পানি কেটে-কেটে। আকাশ কালো, নৌকো কালো, বুড়িগঙ্গার পানি কালো। আর কালো আমিনা বেগমের বিধবা পুত্রবধূর করুণ দু'টি চোখ। একসময় নৌকো বেসামাল হয়ে ওঠে। যাত্রীদের বুক ঝড়ের মুখেপড়া নৌকো। বাঁচতে চাওয়ার ব্যাকুলতা-মেশানো কান্না জাগে বুড়িগঙ্গার বুকে। সে কী কান্না! বুড়িগঙ্গা যেখানে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে সেখানে ডুবল সেই নৌকো। নৌকো যাতে ডোবে তার ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবে করা হয়েছিল আগে থেকেই। নৌকোর তলায় ফুটো করে সেই ফুটোগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছিল খিল দিয়ে। ধলেশ্বরীর কাছে এসে সেসব খিল খুলে ফেলায় নৌকোর ভরাডুবি হ'ল।

আহসান মঞ্জিলের দিকে পিঠ দিয়ে কতদিন দেখেছি বুড়িগঙ্গাকে। আহসান মঞ্জিলকেও তো কম দেখিনি। বাইরে থেকে দেখেছি, ভেতর থেকেও। দেখেছি তার মিয়া আর বিবিদের। আহসান মঞ্জিল মানেই নবাববাড়ি। তার শান-শওকতই আলাদা। একসময় আহসান মঞ্জিল ছিল ফরাসিদের একটা ফ্যাক্টরি। ১৮৩৮ সালে খাজা আলীমুল্লা এটি কিনে নেন। কিন্তু তখনও এটি প্রাসাদ হয়নি। প্রাসাদটি তৈরি করেন নবাব স্যার আবদুল গনি ১৮৭২ সালে। ছেলের নাম অনুসারে তিনি প্রাসাদটির নাম রাখেন আহসান মঞ্জিল। নবাব স্যার আহসানউল্লা বাহাদুর নবাব আবদুল গনির ছেলে। ১৮৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর আহসান মঞ্জিলকে আবার নতুন ক'রে গড়া হয়। এই আহসান মঞ্জিলেই মুসলিম লীগের ধারণা লতিয়ে ওঠে একদিন।

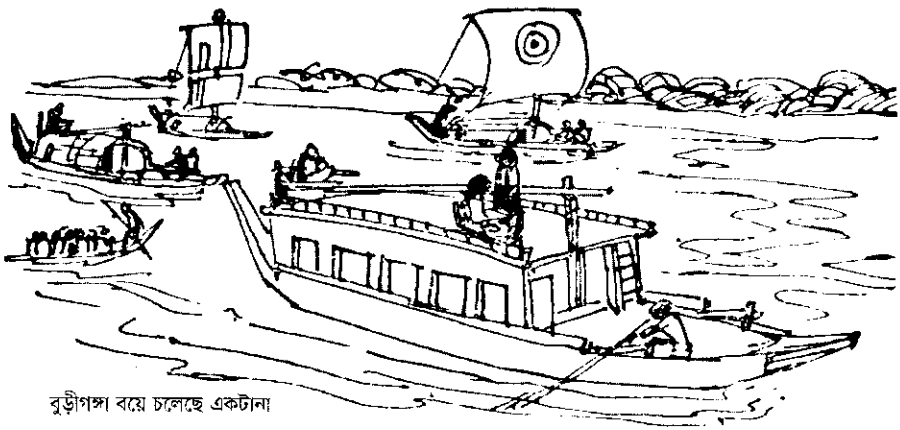

বুড়ীগঙ্গা বয়ে চলেছে একটানা

ছেলেবেলায় দু'বার গিয়েছিলাম আহসান মঞ্জিলে, মানে প্রাসাদের ভেতর। এমনিতে কিন্তু আহসান মঞ্জিলের এলাকা বেশ বড়। অনেক বাড়ি, একটা পুকুর, কিছু অলিগলি—এই সবকিছুই আহসান মঞ্জিলের আওতায় পড়ে। প্রাসাদের ভেতর যেদিন প্রথম পা রাখলাম সেদিন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলাম। তখন অবশ্য আগের জাঁকজমক অতটা আর নেই। তবু একটি বালকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মতো ঝকমকানি তখনও ছিল প্রচুর। দেয়ালে-দেয়ালে চিত্র, ফটোগ্রাফ। বিরাট হলঘরে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। মাথা থেকে নিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত বর্মে-ঢাকা যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে ক'জন। দেখেই ভড়কে গেলাম। কিন্তু শুনে ভরসা পেলাম যে বর্মের ভেতর যোদ্ধা-টোদ্ধা কিছুই নেই। চোখ জুড়িয়ে গেল চমৎকার নকশাদার সাজ-টেবিল দেখে। আর চোখ বড় বড় করে দেখলাম কত জন্তুর মাথা আর কঙ্কাল। পুরোনো কাল যেন মস্ত এক ডালা তুলে ধরেছে আমার সামনে—আমার শুধু চেয়ে দেখা, আমার শুধু অবাক হওয়ার পালা।

আরেকবার এই প্রাসাদে গিয়েছিলাম আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে। দোতলায় বসেছিলাম ফরাসের ওপর। আর আমার বড় ভাই নওশা সেজে বসেছিলেন নবাবি আসনে। তখন তাঁকে নবাব-নবাবই মনে হচ্ছিল। প্রাসাদের ভেতর আর যাইনি কোনোদিন, কিন্তু গিয়েছি আহসান মঞ্জিলের অন্যান্য বাড়িতে অনেকবার। দেখেছি কত পানদান, শুনেছি খানদানি বোলচাল। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার। কোনো কোনো মিয়াকে মনে হ'ত রাজপুত্তুরের মতো আর কোনো কোনো বিবি ছিলেন হুবহু ডানাকাটা পরী। আর এমনি সুন্দরী ছিলেন তো অনেকেই। নবাববাড়িতে অষ্টপ্রহর ধুমধাড়াক্কা লেগেই থাকত। আজ বিয়ে, কাল জন্মদিন, পরশু নাক-ফোঁড়ন, তরশু কান-ছেদন—এসব নিয়েই মেতে থাকতেন মিয়া-বিবিরা। বিড়ে বিড়ে পান, কাশ্মীরি চা আর কাক্‌চা বিস্কুট না হ'লে আসরই জমে না। তার সঙ্গে থাকা চাই ঢোল আর মেরাসিনের গান। এ-বৈঠকই যেন নবাববাড়ির প্রাণ। এছাড়া, সবকিছু কেমন ছাড়া-ছাড়া, ফিকে-ফিকে মনে হ'ত মিয়া-বিবিদের কাছে। আছে, আজও সেই ঢোলের আওযাজ আর মেরাসিনদের গানের রেশ লেগে আছে আমার কানে। এখনও হঠাৎ কোনো মিয়ার মাথা-দুলনি কোনো বিবির হাসির ফোয়ারা কিংবা ঝুঁকে সালাম করার ভঙ্গি ওঠে আমার মনে।

চোদ্দ

ছোরার ছায়ায় বড় হয়েছি। কত অসহায় মানুষের ঘর পুড়তে দেখেছি, দেখেছি ভীষণ ভয়-পাওয়া মানুষেব মুখ। খুনির চিৎকারে কতবার ভেঙে গেছে আমাদের রাতের ঘুম। সেই পুরোনো ধুতি-পাজামার লড়াই, খুনোখুনি। খুন করার নেশায়

পশু হয়ে গিয়েছিল কতকগুলো মানুষ। সারাদেশ আফ্রিকার কালো জঙ্গল হয়ে গিয়েছিল। একসময় লুটতরাজ আর খুনোখুনি ভয়ানক বেড়ে গেল। দাঙ্গা—শুধু দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমান কিছুতেই একসঙ্গে থাকতে রাজি নয়। মুসলমানকে তাড়াতে চায় হিন্দু, আর হিন্দুকে মুসলমান। এ এক দারুণ ঘৃণা, এক অদ্ভুত বিদ্বেষ। কেউ কারও ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চায় না।

একদিন শুনতে পেলাম, দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমাদের হাত-পা থেকে খ'সে গেছে ইংরেজের দু'শো বছরের শেকল। এখন আমাদের দেশ আমাদেরই। পেছনে অত্যাচার আর উৎপীড়নের অনেক স্বাক্ষর রেখে ইংরেজ নিল বিদায়। যাওয়ার আগে ভারতবর্ষকে দু'ভাগ ক'রে এক ভাগ দিল হিন্দুদের আর এক ভাগ মুসলমানদের। সে-দু'ভাগেরই নাম ভারত আর পাকিস্তান। কত লোকের ঘর ভাঙল, মন ভাঙল। সাতপুরুষের ভিটে, নিকোনো উঠোন, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তোলা ফসলের মাঠ ছাড়তে হ'ল অনেককে। ভারতের মুসলমানেরা এল পাকিস্তানে, পাকিস্তানের হিন্দুরা চলল ভারতে। ঘর নেই, ঠিকানা নেই, আছে শুধু যাওয়া। তবু অনেক অনেক মুসলমান থেকে গেল ভারতে, অনেক হিন্দু পাকিস্তানে। সবার পক্ষে সম্ভব হ'ল না পূর্বপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা।

ঢাকার পথে দেখা গেল মোহাজেরদের ভিড়। ঘরহারা মানুষদের চোখেমুখে একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য সে কী আকুলতা! পথেঘাটে উদ্বাস্তু। ঘর নেই, ফুলবাড়িয়া স্টেশনে খালি ওয়াগন আছে। ওখানেই মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজল ওরা অনেকে। ঘরহারা মানুষের দল রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে নতুন ঘরের স্বপ্ন দ্যাখে। আর বারবার ওদের চোখে শুধু ভেসে ওঠে পেছনে-ফেলে-আসা অনেক টুকরো-টুকরো ছবি।

ততদিনে আমি বেশ বড়সড় হয়ে গেছি। কলেজে পড়ি। আমি আছি ঢাকা শহরে। আবু তাহের আছে, আশরাফ আছে, পিনু আছে, শাহজাহান আছে। কিন্তু নেই সূর্যকিশোর, সুবিমল, বিমল, নীহার, শিশির। সুজা আছে, আছে নিরঞ্জন। আমার চেনা অনেকেই নেই। বারবার ওদের কথা মনে পড়ে। ইশকুল ছুটি হলে সূর্যকিশোরের সঙ্গে বাড়ি ফিরতাম মনে পড়ে। অরুণের হাতের লেখা সুন্দর ছিল, মনে পড়ে। শিশির খুঁড়িয়ে চলত, মনে পড়ে। মনে পড়ে আরও অনেক কিছু। সবই ছেঁড়া-ছেঁড়া যা আর কোনোদিনই জোড়া লাগবে না। মনে হুহু হাওয়া বয়। পুরোনো দিনগুলোর দিকে হাত বাড়াই, যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেই দিনগুলো শুধু ছবি দেখায়, দেয় না কিছুই। নাকি ঐ ছবিগুলোই এক মস্ত পাওয়া।

১৯৪৭ সালের চোদ্দই আগস্টে আমরা স্বাধীন হলাম। 'আমরা স্বাধীন হলাম'—কথাটা লিখতে কিন্তু আমার একটুও সময় লাগেনি, কষ্টও হয়নি

বিন্দুমাত্র। শাদা কাগজে কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়ে গেল চট ক'রে। অথচ এই স্বাধীনতার জন্যে আমাদের অনেক অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে অনেককে। বহু শহীদের রক্তের সরোবরে ফুটে উঠেছে স্বাধীনতার রক্তপদ্ম। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে যাঁরাই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদেরই ঠেলে, দেয়া হয়েছে কারাগারের অন্ধকার কুঠরিতে, ফাঁসির মঞ্চে। ফাঁসির কথা উঠলেই আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় শোনা সেই গান, যে-গান শুনে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে বাংলাদেশের অগণিত মানুষ। আজও কান্নায় চোখ ছলছলিয়ে ওঠে সেই গানের রেশ ভেসে এলে ঃ

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি,
দেখবে জগৎবাসী।
শনিবার দিন দশটার পরে
হাইকোর্টেতে লোক না ধরে
অভিরামের দ্বীপান্তর মা,
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
কলের বোমা তৈরি ক'রে
বসাইলাম মা লাইনের ধারে
লাট ম'ল না বিফল হ'ল,
মরল ভারতবাসী।
দশ মাস দশ দিন পরে
জন্ম নেব তোমার ঘরে
চিনতে যদি না পার মা
দেখবে গলায় ফাঁসি।

হাসিমুখেই গলায় ফাঁসি পরেছিলেন

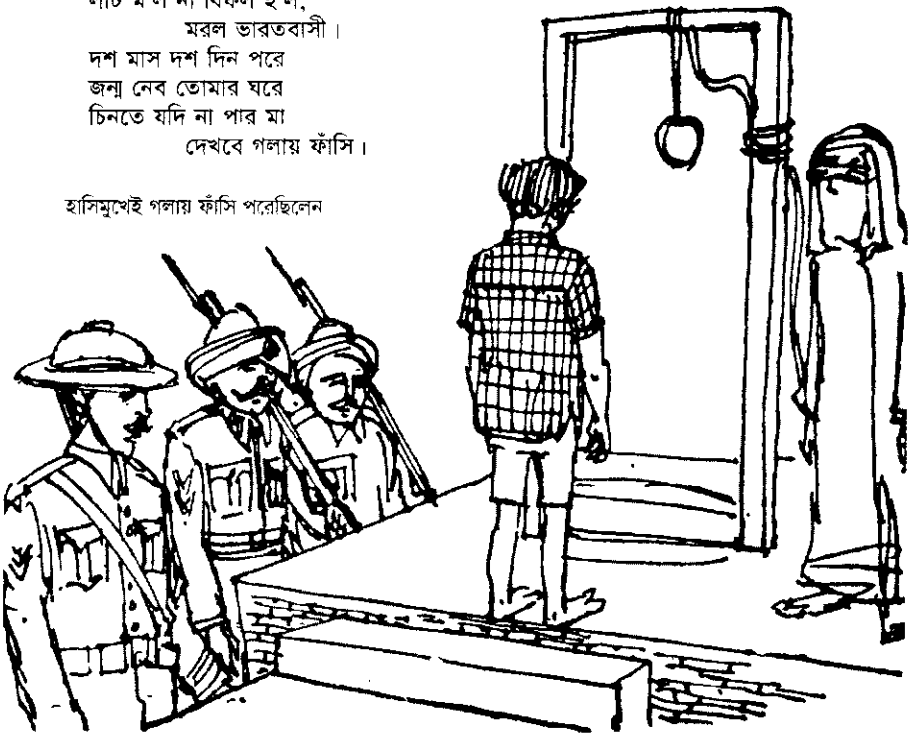

হাসিমুখেই গলায় ফাঁসি পরেছিলেন কিশোর ক্ষুদিরাম বসু। ইংরেজ রাজকর্মচারী কিংসফোর্ডকে বোমা মারার কথা। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের হাত থেকে ছুটল বোমা, কিন্তু বোমা পড়ল ভুল জায়গায়। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন। ক্ষুদিরামের সঙ্গে ছিলেন প্রফুল্ল চাকী। ধরা পড়ার আগেই তিনি পিস্তল দিয়ে নিজের প্রাণ নিজেই শেষ করে দিলেন। ক্ষুদিরামের বিচার হ'ল। আর এর পরিণতি যা হওয়ার তা-ই হ'ল—কিশোর ক্ষুদিরামকে যেতে হ'ল ফাঁসির মঞ্চে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ, যেদিন ব্যারাকপুরে সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে বন্দুক ছুড়েছিলেন লেফটেন্যান্ট বাগকে তাক ক'রে। গুলি লেফটেন্যান্ট বাগের গায়ে না লেগে লাগল তাঁর ঘোড়ার পায়ে।

শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট বাগ মারা গেলেন মঙ্গল পাণ্ডের রাগী তলোয়ারের কোপে। এর বদলে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিতে ঝুলতে হ'ল। মঙ্গল পাণ্ডে শহীদ হলেন। আমাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রথম শহীদ; কিন্তু এর আগে আমাদের স্মরণ করতে হবে ১৭৬৪ সালের একটি ঘটনা। বেঙ্গল আর্মির সিপাইরা গোরা সিপাইদের সমান বেতন দাবি করলেন। কিন্তু সাহেবরা এই ভীষণ বেয়াদবি সহ্য করবেন কেন? তাই বেঙ্গল আর্মির ২৪ জন বীর সিপাইকে বন্দি ক'রে কামানের মুখে উড়িয়ে দেয়া হ'ল।

সেদিনের সেই কামানের ধোঁয়া বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু ২৪ জন বীর সিপাইয়ের মনের ধোঁয়া কখনো বিলীন হয়নি। সেই ধোঁয়া রয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে। সেই ধোঁয়া জমে উঠেছিল আজিজুল্লাহ খাঁর মনে, মঙ্গল পাণ্ডের মনে, বিদ্রোহী মৌলবি আহমদ শাহের মনে। এঁদের সবার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে আরও অনেকের কথা।

আর মনে রাখতে হবে ঢাকার কালা-ধলার লড়াইয়ের কথা। দেশের অন্যান্য এলাকায় যখন সিপাই বিপ্লবের পড়েছে ভাটা তখন ঢাকার লালবাগে জাগল এক নতুন জোয়ার। ঢাকার কালা সিপাইরা ধলাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ দানা বাঁধার আগেই ব্রিটিশের খয়ের খাঁ খাজা নবাব আবদুল গনি কমিশনারকে সিপাইদের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিলেন। কী ক'রে সিপাইদের শায়েস্তা করা যায় এ-সম্পর্কে ইংরেজদের দু'একটা দামি শলা দিতেও কসুর করলেন না তিনি। বিভিন্ন জায়গায় সিপাইদের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হ'ল। কিন্তু লালবাগের সিপাইরা জান দেবেন তবু হাতিয়ার দেবেন না। লালবাগ ঘিরে ফেলা হ'ল। যুদ্ধ চলল দু'দলের মধ্যে। লড়তে লড়তে প্রাণ হারালেন চল্লিশ জন বীর সিপাই। জখমি হলেন অনেকে। যাঁরা বন্দি হলেন তাঁদের ফাঁসিতে লটকানো হ'ল আন্টাগড়ের ময়দানে। এদিকে ইংরেজ প্রভুদের চোখে খাজা আবদুল গনির কদর

বেড়ে গেল। খাজা আবদুল গনি বনলেন নবাব। ঢাকার নবাবরা কিছু-কিছু ভালো কাজ করেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁদের সেসব কাজের আলো কি কোনোদিন ঢাকতে পারবে নবাব আবদুল গনির সেই কুকীর্তির কালিমাকে?

ঢাকার খাস বাসিন্দাদের অনেকেই 'কুট্টি' ব'লে উপহাস করে, কেমন যেন ঘৃণার চোখে দেখে। তারা লেখাপড়া শেখেনি, মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এর কারণ কি কেউ খতিয়ে দেখেছেন কোনোদিন? ঢাকার নবাবরা কি দায়ী নন ওদের এই অবস্থার জন্যে? দিনের পর দিন ঢাকার নবাবরা শোষণ করেছেন ওদের; কিন্তু শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেননি ওদের জীবনে। হয়তো ভয় পেয়েছেন এ ভেবে ঃ শিক্ষা পেলে যদি বিগড়ে যায় ওরা, যদি মানতে না চায় তাঁদের নবাবি।

পনেরো

কোনোদিন ভুলব না উনিশশো পঁয়তাল্লিশের সেই বিকেলের কথা। ঘুম-ভাঙা চোখে দেখলাম একফালি রোদ এসে পড়েছে আমার ঘরে। যেন রূপকথার দেশ থেকে এসেছে এই রোদ, এত মধুর, এত রূপসী। সারা মন গুনগুনিয়ে উঠল রোদের সোনালি তারের সাড়া পেয়ে। রোদ থেকে চোখ স'রে আসতেই দেখলাম, বিছনায় প'ড়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'। দ্বিতীয় খণ্ড। কুড়িয়ে নিলাম। ক্লাস নাইন-টেন-এ আমাদের পড়ানো হয়েছে 'গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ড। অনেক গল্পই পড়া। চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দেখলাম, শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়ার জো নেই। ডুবে যেতে হ'ল গল্পগুচ্ছের ভেতর। পুরোনো, প্রায়-ছেঁড়া বই একেবারে নতুন হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, বিনয়বাবু পড়িয়েছেন সুন্দরভাবে, তবু এতে ভালো লাগেনি এর আগে। আমি যেন স্বর্গের এমন এক বাগানে পৌঁছে গেলাম, যার প্রতিটি গাছ সুন্দর, প্রতিটি ফুল অনন্য।

'গল্পগুচ্ছ' আমার পড়ার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিল। মন ব'লে উঠল "আরও বই চাই, রবীন্দ্রনাথের বই চাই, চাই আরও অনেকের বই।" তাই বইয়ের খোঁজে আমার যাত্রা হ'ল শুরু। একদিন পাটুয়াটুলি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পাটুয়াটুলির শেষ সীমায় এসে চোখে ঝলসে উঠল একটা নাম—রামমোহন রায় লাইব্রেরী ও রিডিংরুম। একটুও দেরি না ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম তাড়াতাড়ি। লাইব্রেরি-ঘরে পা রাখতেই বই-বই গন্ধে মন ভ'রে উঠল। বুড়ো এক ভদ্রলোক লাইব্রেরিয়ান। নাম শ্রীগগনচন্দ্র আচার্য। সেদিনই লাইব্রেরির সদস্য হয়ে গেলাম। কত বই! যেদিকেই তাকাই, বই আর বই। নতুন আর পুরোনো। আলমারিতে থরেথরে সাজানো। মন-কেড়ে-নেয়া রবীন্দ্র রচনাবলি। 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' আর 'বসুমতীর' সেট। দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা

বিষয়ের বইয়ে নানা আলমারি ভরা। যত পার পড়ো। রিডিংরুমে ব'সে পড়ো, বাড়িতে নিয়ে পড়ো। প্রথম যেদিন 'রামমোহন রায়' লাইব্রেরির বই হাতে নিয়ে বাড়ি এলাম, সেদিন রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের মজা পেয়েছিলাম। আমার শরীর-মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সেইদিন। তারপর কতবার বই নিয়েছি গগনবাবুর হাত থেকে। গগনবাবু বহুকাল লাইব্রেরিয়ান পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬৩ সালে একরাতে পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দোতলা থেকে প'ড়ে গিয়ে মারা যান তিনি।

১৮৭৩ সালে পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজের গ্যালারিতে একটা ছোট লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের সবার জন্যে প্রয়োজন ছিল রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলি। এই প্রয়োজনের খাতিরেই লাইব্রেরির সূচনা। ১৮৮১ সালে জনসাধারণও ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিটি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। ১৯০৯ সালে সমাজের গ্যালারি থেকে লাইব্রেরিটি সরিয়ে আনা হ'ল নতুন একটি ঘরে। এ-ঘর তৈরি হয় ১৯০৮ সালে। ঘর তৈরির জন্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার রত্নমণি গুপ্ত দেন পাঁচ হাজার টাকা। ঢাকার নবাববাড়ি থেকে বেশকিছু টাকা পাওয়া যায়। আর টাকা দিয়েছিলেন জমিদার রূপলাল দাশ। আরও নানা জায়গা থেকে পাওয়া যায় কিছু টাকা। লাইব্রেরির নাম রাখা হ'ল 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও রিডিংরুম'। গোড়ার দিকে লাইব্রেরিতে প্রায় পাঁচ হাজার বই ছিল, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন পূর্ব বাঙলা ব্রাহ্মসমাজে। রামমোহন রায় লাইব্রেরিতেও এসেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কিছু বই উপহার দিয়েছিলেন লাইব্রেরিতে। একসময় রামমোহন রায় লাইব্রেরিতে নিয়মিত আসতেন 'প্রবাসী' সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, রায়সাহেব সত্যেন্দ্র ভদ্র, ডক্টর হেরম্বকুমার মৈত্র, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মনমোহন ঘোষ ও কবি অজিত দত্ত।

ঢাকার আরেকটি পুরোনো গ্রন্থাগার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের ঢাকায় আসার ঘটনাটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্যই ১৮৮০ সালের ২৫শে মে নর্থব্রুক হল ও ১৮৮২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই হলে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে গ'ড়ে তোলা হয় লাইব্রেরিটি। ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় পাঁচ হাজার টাকা, ত্রিপুরার মহারাজা এক হাজার টাকা, বালিয়াটির বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় এক হাজার টাকা, মহারানি স্বর্ণময়ী সাতশো টাকা দেন। এছাড়া আরও অনেকে টাকা দিয়েছিলেন নর্থব্রুক হল লাইব্রেরির জন্য। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ঢাকার বিবরণ' বইয়ে

লিখেছেন, "ঢাকার শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি নর্থব্রুক হল লাইব্রেরী।" বইটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার কিন্তু 'রামমোহন রায় লাইব্রেরী' সম্পর্কে একেবারেই নীরব। অথচ রামমোহন রায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৯ সালে। তা হলে কি ব্রাহ্মদের লাইব্রেরি ব'লেই 'ঢাকার বিবরণে' লেখক এ-সম্পর্কে নীরব থেকে গেছেন? 'রামমোহন রায় লাইব্রেরী'র কাছে আমি ঋণী। এই লাইব্রেরি আমার পক্ষে হয়ে উঠেছিল এক রত্নদ্বীপ। আমি ঘুরে বেড়িয়েছি সেই দ্বীপের আনাচে-কানাচে। এই ঘুরে বেড়ানোর আনন্দেই বেশি করে ভালোবেসেছি আমার বাংলা ভাষাকে, ভালোবেসেছি সাহিত্যকে। নিজে কোনোদিন লিখব, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ক্লাস এইটে পড়ার সময় আমি আমার বোনকে হারাই। দু'বছরের ছোট্ট মেয়ে নেহার। তখনও কথা বলতে শেখেনি।

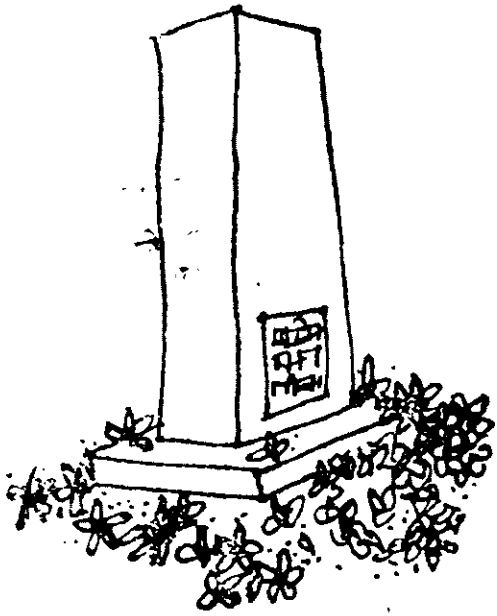

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই

টুক টুক করে তাকাত, কোলে আসার জন্যে মেলে দিত দু'হাত। কোলে নিলেই খুশি। বড় ভালো লাগত ওকে। একদিন ইশকুল থেকে এসে দেখি সে নেই। নেহারের চঞ্চল দুটো চোখ একেবারে নিথর হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। বড় ব্যথা পেয়েছিলাম সেদিন। নেহারের মৃত্যুর দু'-তিনদিন পর কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। কলম শাদা কাগজের বুকে ঝরিয়ে দিল আমার বোন-হারানোর

ব্যথা। সেই গদ্যরচনাটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্ন মুকুল' কবিতার প্রভাব। লেখাটি শেষ হওয়ার পর কেমন একটা মুক্তি পেলাম। যেন নেহারকে কথা দিয়েছিলাম, এ-লেখা আমি লিখবই। তাই কথা রাখতে পেরে আমার মন বনের পাখির মতোই মুক্ত হ'ল আবার।

আমি সত্যি সত্যি লেখা শুরু করি অনেক পরে। তবে বরাবরই বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসা বোধ করেছি। মোদের গরব মোদের আশা, আ'মরি বাংলা ভাষা।

অনেক কথাই বলা হ'ল। অনেক কথাই শোনানো হ'ল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমিকে। আমার কথা ফুরোলে চেয়ে দেখি, দৃষ্টির সামনে গাছ নেই, গাছের ডালে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি নেই। সব খালি, সব ফাঁকা। তবে এতক্ষণ কাদের শোনালাম ঢাকা শহরের পাঁচালি? এ কি নিজের মনের সঙ্গে কথা বলা? হয়তো তা-ই। আর এই তো আবার আমি ঢাকা শহরের মুখোমুখি, যে-শহর আমার শহর, আমার স্মৃতির শহর।

boierpathshala.blogspot.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট

২০১৩ শিক্ষা বছরে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির মূল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের জন্য মুদ্রিত

সপ্তম শ্রেণির পুরস্কার

বিক্রির জন্য নয়